Helium In The Sun, Helium Makes Fun

হিলিয়াম

জ্যোতিরসায়ন

হিলিয়াম
জ্যোতিরসায়ন

কেমফিউশন হিলিয়াম-জ্যোতিরসায়ন
Helium In The Sun, Helium Makes Fun
এপ্রিল ২০২১ প্রথম বর্ষ , সংখ্যা ০২

সম্পাদক
জাবেদুল হক
শিজোকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান

সহ সম্পাদক
আশীমা মনজুর
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সিলেকশন এন্ড প্রুফরিড

নাইমুন মুনতাহা অরণ্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পার্থ প্রতিম মধু
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

নুসরাত তাবাসসুম সৃষ্টি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আনিকা নাওয়ার চৌধুরী
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রাফিক্স এন্ড ডিজাইন
আসিফ হাসান
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাক্যবিন্যাস
আশরাফুল হাসান
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

স্কেচিং
সানজিদা তানজিদ লামিয়া
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশক : কেমফিউশন
তারিখ :২৯ এপ্রিল, ২০২১

ChemFusion

জাবেদুল হক
শিজোকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান

কেমফিউশনের প্রথম বছরের পরিক্রমায় সবাইকে একরাশ ফুলেল শুভেচ্ছা।বিগত দিনে বেশ কিছু সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে এক ঝাঁক উদ্যমী তরুণের হাত ধরে অন্তহীন উদ্দেশ্যের পথে ছুটে চলছে কেমফিউশন! দ্বিতীয় বছরের সূচনালগ্নে আমাদের নতুন আয়োজন, ম্যাগাজিনের ২য় সংখ্যা "হিলিয়াম-জ্যোতিরসায়ন", যেখানে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝে পুঞ্জিভূত রসায়নের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য, জানা অজানা কল্পকাহিনী তরুণদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষুদ্রপ্রয়াস।

কেমফিউশনের অন্যতম উদ্দেশ্য রসায়নের অসীম বিস্তৃত জগতের লুকায়িত সৌন্দর্যকে পরিস্ফুটিত করা।রসায়নের উন্মুক্ত দ্বার সমূহকে মাতৃভাষায় শব্দশৈলীর বুননে একীভূত করা এবং তা সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া! তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে কেমফিউশন এর ম্যাগাজিনে।

রসায়নকে সর্বোস্তরের মানুষের কাছে পৌছে দেওয়ার জন্য কেমফিউশন এর এহেন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই! সর্বোপরি একঝাঁক স্বপ্নবাজ তরুণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কেমফিউশনের পথচলা সাফল্যমণ্ডিত হোক।" রসায়ন চর্চা হোক জানার জন্য ও জীবনের জন্য"

হিলিয়াম

জ্যোতিরসায়ন

ChemFusion
www.chemfusion.net

1. আব্দুস সাত্তার খান : নাসায় প্রথম বাংলাদেশি বিজ্ঞানী

2. হিলিয়াম ও তারাদের গল্প ৩. সৌরজগতের রসায়ন

3. সূর্য

4. বুধ

5. মংগল

6. --- মঙ্গলের টেরাফর্মি

7. --- মঙ্গলে পানি

8. মঙ্গলে অক্সিজেন

9. শুক্র

10. ---- লাইফ ইন ভেনাস

11. পৃথিবী

12. বৃহস্পতি : আকাশ দেবতা

13. টাইটানের জাদুকরী দ্বীপ

14. ইউরেনাস

15. নেপচুন

16. ইউরেনাস-নেপচুনে হীরক বৃষ্টি

17. রহস্যময় প্লুটোয় নীল কুয়াশা

18. মহাকাশে পানি

19. নাসা, স্পেসমিশন ও রসায়ন

20. নভোচারীর কলমে রসায়ন

21. এন্টার্কটিকায় ওজোন গর্ত.....

22. একটি সৌরজগত বহির্ভূত অণু

ছিলিয়াম
জ্যোতিরসায়ন

ChemFusion
www.chemfusion.net

আব্দুস সাত্তার খান: নাসায় প্রথম বাংলাদেশি বিজ্ঞানী

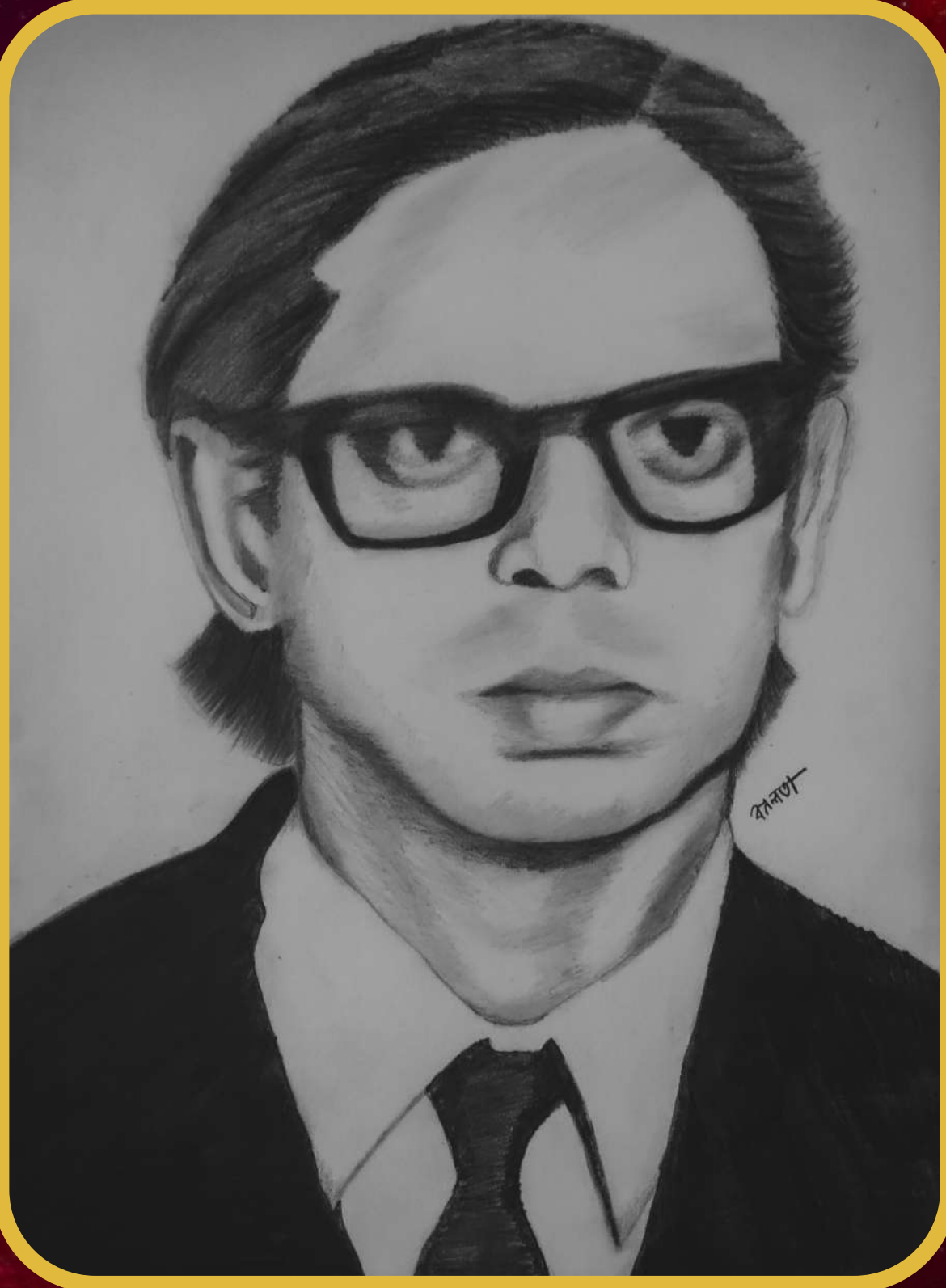

স্কেচিং - সানজিদা তানজিদ লামিয়া

বাংলাদেশ থেকে নাসায় যোগ দেওয়া প্রথম বিজ্ঞানীর নাম আব্দুস সাত্তার খান।বাংলাদেশের কতজন আব্দুস সাত্তার খান সম্পর্কে জানেন? কিছু মানুষ জানলেও সিংহভাগ হয়ত নামই শোনেনি।আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই মহান বিজ্ঞানীর সম্পর্কে না জানতে পারলে হতাশায় থেকে যেতে পারে যে আমাদের দেশে মনে হয় তেমন কোন বিজ্ঞানী আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ছিলেন না বা যেতে পারেন নি।নাসা সম্পর্কে জানে না এমন মানুষ খুজে পাওয়া কষ্টকর।নাসায় কী করা হয় সেটা সম্পর্কে পুরোটা না জানলেও এটা সবারই জানা কথা যে নাসা থেকে রকেট পাঠানো হয় পৃথিবীর বাইরে।প্রচার প্রচারণার অন্তরালে থেকে যাওয়া নাসার এই মেধাবী মানুষ টি সম্পর্কে চলুন বিস্তারিত জেনে নেয়া যাক।

আব্দুস সাত্তার খান ১৯৪১ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলায় খাগাতুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম নেয়া সাত্তারের জন্মের নির্দিষ্ট তারিখটিও সংরক্ষণ করা হয়নি।মাত্র আট বছর বয়সে তাঁর বাবা মারা যান।এজন্য সাত্তারের মা তাঁকে নিয়ে পিত্রালয়ে চলে যেতে বাধ্য হন।তখনকার আট দশটা ছেলে-মেয়ের মতোই বেড়ে উঠতে থাকেন সাত্তার খান।প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য তাঁকে যেতে হতো কয়েক মাইল দূরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।ছোট বেলা থেকে মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছেন জ্ঞানার্জনের অনন্য স্পৃহা।

জ্ঞানার্জনের আগ্রহ থেকেই কয়েক মাইল পথ পাড়ি দিয়ে চলে যেতেন বিদ্যালয়ে।বিদ্যালয়ের ভাঙা বেঞ্চটাকেই আরাম কেদারা ভেবে চালিয়েছেন পড়াশোনা।ফলাফলটাও পেয়েছেন হাতেনাতে; প্রথম শিক্ষার্থী হিসেবে বোর্ড স্ট্যান্ড করেন মাধ্যমিকে রতনপুর আবদুল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে।আর কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়ালেখা শেষ করে সুযোগ পান দেশ সেরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগ থেকে ১৯৬২ সালে স্নাতক (সম্মান) ও ১৯৬৩ সালে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে।এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই রসায়ন বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন।১৯৬৪ সালে ডক্টরেট করতে যান অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১৯৬৮ সালে রসায়নের উপর ডক্টরেট ডিগ্রিও অর্জন করে ফেলেন। এরপর তিনি দেশে ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন।ঐ বছরই তিনি ধাতব প্রকৌশল নিয়ে গবেষণা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র গমন করেন।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালো রাতে হানাদার বাহিনীর নির্মম আক্রোশের শিকার হতে পারতেন সাত্তার।যখন বুঝতে পারলেন পাক সেনারা চলে এসেছে, ততক্ষণে বাইরে পালানোর আর কোনো উপায় নেই।তাই হতবুদ্ধি হয়ে চুপচাপ শুয়ে রইলেন খাটের নীচে।কিন্তু পাকিস্থানি সৈন্যরা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে কাউকে না পেয়ে চলে যায়! সৈন্যদের কেউ যদি সেদিন হাঁটু গেড়ে বসে খাটের নীচটা দেখার চেষ্টা করতো, তাহলে কী হতো ভেবেই গা শিউরে উঠে!

১৯৭৩ সালে সাত্তার খান সংকর ধাতু নিয়ে উচ্চতর গবেষণার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এএমএস গবেষণাগারে ২ বছরের জন্য যোগদান করেন।ঐ সময়টা ছিল জেট ইঞ্জিনের জন্য 'উন্নয়নকাল' ।জেট ইঞ্জিন তৈরির খরচ কমাতে এবং বিমানকে আরো গতিময় কর তুলতে তখন প্রচুর গবেষণা হচ্ছিল।তিনিও এই স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেন।সে সময় ঘর্ষণের ফলে পিস্টন ক্ষয়ে যাওয়া জেট ইঞ্জিনের বড় একটি সমস্যা ছিল।ইঞ্জিনে জ্বালানির দহনে যে উচ্চ তাপ উৎপন্ন হয়, অধিকাংশ ধাতুই সেটিতে সহনশীল নয়।সেজন্য দরকার ছিল উপযুক্ত সংকর ধাতুর যা এই তাপ সহ্য করার ক্ষমতা রাখে।আর তাই এ সময়ের অধিকাংশ গবেষণার মূল উপজীব্য বিষয় ছিল সংকর ধাতু উৎপাদন, যা কি না বিমান তৈরি এবং জেট ইঞ্জিনের জন্য উপযোগী হবে।

আব্দুস সাত্তার খান গবেষণায় দুর্দান্ত সাফল্য পান।আইওয়াতে আড়াই বছরের গবেষণায় ১০-এর অধিক Alloy (সংকর ধাতু) তৈরির কীর্তি রয়েছে তাঁর।তিনি নাসা ইউনাইটেড টেকনোলজিস এবং অ্যালস্টমে কাজ করার সময়ে ৪০টিরও বেশি সংকর ধাতু উদ্ভাবন করেছেন।এসব সংকর ধাতু উচ্চ তাপমাত্রায় ব্যবহার উপযোগী হওয়ায় গ্যাস টারবাইনের ব্লেডের প্রান্ত কিংবা জেট ইঞ্জিনে বেশ উপযোগিতার প্রমাণ দেয়।এই সংকর ধাতুগুলো ইঞ্জিনকে আরো হালকা করেছে, যার ফলে উড়োজাহাজের আগের চেয়ে দ্রুত উড্ডয়ন সম্ভব হয়েছে এবং ট্রেনকেও করেছে অধিক গতিশীল ।

১৯৭৬ সালে নাসার লুইস রিসার্চ সেন্টারে গবেষণা শুরু করেন আব্দুস সাত্তার খান।এখানে এসে তিনি মহাকাশযানে ব্যবহারোপযোগী সংকর ধাতু নিয়ে কাজ শুরু করেন।গবেষণার ফলস্বরূপ তৈরি করতে সক্ষম হন নিকেল ও অ্যালুমিনিয়ামের একপ্রকার অত্যন্ত উন্নতমানের সংকর।এই ধাতু বিমানের জ্বালানী সাশ্রয় করে, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করে এবং কার্যক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।তাছাড়া এসব ধাতুর ব্যবহার ছিল রকেটেও।

সাত্তার খানের উদ্ভাবিত সংকর ধাতুগুলো এফ-১৬ ও এফ-১৭ যুদ্ধবিমানের জ্বালানি সাশ্রয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বলে ধারণা করেন অনেকেই ।মার্কিন বিমান বাহিনীর জন্য যুদ্ধবিমান তৈরির কাজে পরবর্তীতে সরাসরি নিযুক্তও হন তিনি।৭০-এর দশকে বিমান তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করায় সাত্তার খান জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান প্রাট অ্যান্ড হুইটনির নজরে আসেন।এজন্য এ কোম্পানি সাত্তার খানকে গবেষণার জন্য অর্থায়ন করে।অর্থায়নের ফলে তাঁর গবেষণার কাজ আরও সহজ হয়ে যায়।তাঁর গবেষণা থেকে প্রাপ্ত নিকেল ও তামার মিশ্রণই ব্যবহৃত হয় বিমানের ইঞ্জিন তৈরিতে।এই ধাতু হালকা হওয়াতে ইঞ্জিনের ওজন কমে যায়, গতি এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়।এ আবিষ্কারের জন্য সাত্তার খানকে “ইউনাইটেড টেকনোলজিস স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড” প্রদান করা হয়।নাসা ইউনাইটেড টেকনোলজি এ আবিষ্কারকে ২০ শতকের বিমান গবেষণায় শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলে আখ্যায়িত করে।বিখ্যাত মার্কিন বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী “পপুলার সায়েন্স” একে বিংশ শতাব্দীর সেরা আবিষ্কারগুলোর একটি বলে অভিহিত করে।

আব্দুস সাত্তার খানের কিছু গবেষণার কথা উল্লেখ না করলেই নয়, যা বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে এখনো ব্যবহৃত হয়ে আসছে-

- কাটিং-এজ জেট ইঞ্জিনের জ্বালানি বাষ্পে তাঁর তৈরি ন্যানো-ক্যাটালিস্ট ব্যবহার করা হয়, যা অর্থসাশ্রয়ী।
- তাঁর গবেষণা যুদ্ধ বিমানের ইঞ্জিনকে জ্বালানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী করার ফলে যুদ্ধবিমান অধিক দূরত্ব অতিক্রম করতে পারছে।
- প্রাট অ্যান্ড হুইটনিতে থাকাকালীন তাঁর গবেষণায় প্রাপ্ত তাপীয় অবসাদ ও ক্ষয়রোধী প্রলেপ দেয়ার পদ্ধতি চালু হলে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক সাফল্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে যায়।
- অ্যালস্টম কোম্পানির ব্যবহৃত গ্যাস টারবাইন ইঞ্জিন উন্নয়নে তাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি।
- অ্যালস্টমের অত্যাধুনিক জি-১১ গ্যাস টারবাইনে ব্যবহৃত হচ্ছে তাঁর আবিষ্কৃত জারণরোধী প্রলেপযুক্ত যন্ত্রাংশ।

একুশ শতকের আগমনের সাথে সাথে কর্মস্থল পরিবর্তন করেন সাত্তার খান।তিনি বলেছিলেন, একস্থানে কাজ করে একঘেয়েমি ধরে গিয়েছিল তাঁর।প্রাট অ্যান্ড হুইটনি ছেড়ে দিয়ে যোগ দিলেন সুইজারল্যান্ডের অ্যালস্টমে কোম্পানিতে।তখন জ্বালানি উৎপাদনের জন্য এটিই বিশ্বের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান।এ প্রতিষ্ঠানে মাত্র পাঁচ বছর কাজ করেই নামের পাশে যোগ করেন ২৫টি পেটেন্ট এবং পুরো জীবনে তিনি ৩১ টি পেটেন্টের মালিক হয়েছেন।শুধু চিন্তা করুন, বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত ঘরের একটি ছেলে অদম্য ইচ্ছা শক্তির কারণে বিশ্ব দরবারে বাংলাকে উপহার দিয়েছেন ৩১ টি পেটেন্ট।

সংকর ধাতু বিষয়ক গবেষণা এবং মহাকাশে তার প্রয়োগের জন্য নাসা, আমেরিকান বিমানবাহিনী, ইউনাইটেড টেকনোলজি এবং অ্যালস্টম থেকে আব্দুস সাত্তার খান অসংখ্য পুরস্কার লাভ করেন।তিনি ২০০৫ সাল থেকে যুক্তরাজ্যের রয়েল সোসাইটি অব কেমিস্ট্রিতে পেশাজীবি বিজ্ঞানী হিসেবে এবং এর আগে ১৯৯৬ সালে এখান থেকে ফেলো নির্বাচিত হন।যুক্তরাষ্ট্রের সোসাইটি অব মেটালসেরও সদস্যপদ লাভ করেন তিনি।

বাংলার মানুষের কথা ভেবে ১৯৯১ সালে বন্যাদুর্গতদের সাহায্যের জন্য প্রায় ৬১০০০ ডলার সংগ্রহ করে রেড ক্রসের মাধ্যমে বাংলাদেশে পাঠান।দেশের মানুষের জন্য তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করে গেছেন।

জীবনের বাকিটা সময় কাটিয়েছেন আমেরিকায়, সেখানকার নাগরিকত্ব নিয়ে।২০০৮ সালের ৩১ জানুয়ারি, ৬৭ বছর বয়সে আমেরিকার ফ্লোরিডায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আমাদের দেশের এই মহান বিজ্ঞানীকে শুধু তার কাজের জন্য বিশ্ববাসী যেমনি ভাবে সম্মান এবং স্মরণ করে আসছে, ঠিক তেমনি করে আমাদেরও তাঁর সম্পর্কে এবং তাঁর কাজ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

হিলিয়াম ও তারাদের গল্প

হিলিয়াম

খুব ছোটবেলায় বাবার হাত ধরে বেড়াতে যাওয়ার সময় নিশ্চয়ই কমবেশি সবাই বায়না ধরতাম বেলুন কিনে দেওয়ার জন্য।আর সে বেলুন যদি গ্যাস বেলুন হয় তাহলে তো কথাই নেই! সেগুলো হাত থেকে ফসকে গেলেই হলো- মজার বেলুন ছুটে যেতো আকাশপানে।কত ভাবতাম কোথায় যায় এই বেলুনগুলো।হিলিয়ামের সাথে আমাদের পরিচয়টা তখন থেকেই।আমাদের আজকের গল্পটাও তাকে নিয়েই।

পর্যায় সারণিতে যেসব "উচ্চবংশের" (ইংলিশে বলা হয় "noble gas", কারণ প্রকৃতিতে তারা কখনো বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না) মৌল রয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আমাদের আজকের মহাশয় "হিলিয়াম"।রসায়নের ভাষায় হিলিয়াম পরিচিত “নিষ্ক্রিয় গ্যাস” হিসেবে।একে সূচিত করা হয় He দিয়ে।হাইড্রোজেনের পর সবচেয়ে হালকা মৌল হলো এই হিলিয়াম।মহাবিশ্বে প্রাচুর্যতার দিক থেকেও এর অবস্থান হাইড্রোজেনের পরপরই।এটি একটি অধাতু ও প্রকৃতিতে আমরা একে গ্যাসীয় অবস্থায় পাই।ধারণা করা হয়ে থাকে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হওয়ার প্রথম তিন মিনিটের মধ্যেই হিলিয়াম তৈরি হয়েছিল।আমাদের সূর্য ও অন্যান্য তারাতেও হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়ার ফিউশনের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত হিলিয়াম তৈরি হয়ে থাকে।শনি গ্রহের প্রধান গ্যাসও হলো এই হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন।

কিভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল হিলিয়াম:

হিলিয়াম আবিষ্কারের গল্প আর তারাদের গঠন আবিষ্কারের গল্পটা যেন একই সুতোয় গাঁথা।হিলিয়াম হলো একমাত্র মৌল যার আবিষ্কার আমাদের এই ধরায় হয় নি- তার আবিষ্কার হয়েছিল একটি তারায়- সূর্যে।একটা সময় ছিল যখন মানুষ ভাবত ওই দূরের মিটিমিটি নক্ষত্ররা যে কিসের তৈরি তা আমাদের পক্ষে কখনো জানা সম্ভব হবে না।এমনকি ১৮৩৫ সালে একজন ফ্রেঞ্চ দার্শনিক অগাস্ট কম্ট (Auguste Comte) বলে বসলেন, "আমরা কখনো কোনোভাবেই তারাদের রাসায়নিক গঠন গবেষণা করতে পারব না।'

কম্ট ভেবেছিলেন তারাদের সম্পর্কে আমরা কেবল তখনই জানতে পারব যদি তাদের কিছু অংশ আমরা আমাদের ল্যাবরেটরিতে এনে পরীক্ষা করতে পারি।কিন্তু তাঁর এমন নিরাশাজনক কথা শেষ পর্যন্ত ভুল প্রমাণিত হলো।১৮১৪ সালে তারাদের গঠন নির্ণয়ের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়।ভাবতেই কি অবাক লাগে না? ওই এত দূরের সূর্য কিসের তৈরি তা আমরা আমাদের পৃথিবীর ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করেই বলতে পারি।শুধু সূর্যই না, প্রায় সব তারার গঠন এই পদ্ধতিতে আমরা জানতে পারি।

যা হোক, সেই বছর অর্থাৎ ১৮১৪ সালে জার্মান পদার্থবিদ জোসেফ ফ্রনহফার নিউটনের প্রিজমের সাহায্যে সূর্যরশ্মিকে সাতটি রঙের বর্ণালিতে বিভক্ত করে ফেলার পরীক্ষাটিতে আরো উন্নতি আনতে সক্ষম হন।ফ্রনহফার লক্ষ করলেন প্রিজমের মাধ্যমে বিভক্ত হওয়া সূর্যরশ্মির বর্ণালি বা রংধনুতে কিছু অন্ধকার বা কালো রেখা দেখা যাচ্ছে।যে রেখাগুলি তিনি দেখেছিলেন তা ছিল মানুষের দেখা সর্বপ্রথম তারার বর্ণালি।

হিলিয়াম

জ্যোতিরসায়ন

১৮৫৯/৬০ সালে জার্মান বিজ্ঞানী গুস্টাভ কির্শফ এবং রবার্ট বুনসেন আধুনিক বর্ণালিমিতি (spectroscopy)-তে দারুণ অবদান রাখেন।তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন ফ্রনহফারের আবিষ্কৃত কালো রেখাগুলি যেন কোনো পদার্থের ফিঙ্গারপ্রিন্ট! অর্থাৎ, আঙ্গুলের ছাপের সাহায্যে আমরা যেমন কাউকে শনাক্ত করতে পারি, তেমনি ওই রেখাগুলোর সাহায্যেও যে কোনো মৌলকে শনাক্ত করা যায়।কির্শফ এবং বুনসেন জ্বলন্ত অবস্থায় মৌলগুলো থেকে নির্গত আলোকরশ্মি পরীক্ষা করে নতুন নতুন মৌল আবিষ্কার করতে থাকলেন।১৮৬০ ও ১৮৬১ সালে তারা সিজিয়াম ও রুবিডিয়াম আবিষ্কার করলেন যথাক্রমে নীল ও দুটো লাল বর্ণালি রেখা দেখে।কির্শফ এবং বুনসেন সূর্যের বর্ণালি পরীক্ষা করে সূর্যের বায়ুমণ্ডলে আয়রনের উপস্থিতিও বুঝতে পারলেন।যার ফলে হাজার কোটি আলোকবর্ষ দূরে থাকা তারারা কি নিয়ে তৈরি সে সম্পর্কে জানতে আমাদের আর কোনো বাধা রইল না।

তবে হিলিয়ামের আবিষ্কার হওয়ার গল্পটা শুরু হয় আরেকটু দেরিতে।

সময়টা ১৮৬৮ সাল।এক পূর্ণ সূর্যগ্রহণের দিন ফ্রেঞ্চ জ্যোতির্বিদ পিয়েরে জ্যানসন অপেক্ষা করছিলেন স্পেক্ট্রোস্কোপ বা বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সূর্যের করোনা (সূর্যের বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে বাইরের স্তর, যা পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় দেখতে পাওয়া যায়) থেকে বিচ্ছুরিত আলো পরীক্ষা করার জন্য।পরবর্তী দু'সপ্তাহে তিনি সূর্যগ্রহণ ছাড়াই সূর্যের বিচ্ছুরিত আলোর বর্ণালি পরীক্ষা করার একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন।আর সেই বর্ণালিতে তিনি একটি নতুন হলুদ রেখা দেখতে পেলেন।রেখাগুলোর সাথে সোডিয়ামের বর্ণালিরেখার সাদৃশ্য থাকলেও অবস্থানগত মিল ছিল না। ইংরেজ বিজ্ঞানী নরম্যান লকইয়ার রেখাটি পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন এটি একটি নতুন মৌলের বর্ণালি রেখা। তিনি এর নাম রাখলেন "হিলিয়াম" যার ব্যুৎপত্তি গ্রিক সূর্যদেবতা "হেলিওস" (Helios) এর নামানুসারে।কিন্তু তখনও হিলিয়ামের অস্তিত্বকে পুরোপুরি মেনে নিতে অনেকেই রাজি হলেন না।

অবশেষে সব সন্দেহের অবসান হলো ১৮৯৫ সালে।এর আগের বছর অর্থাৎ ১৮৯৪ সালে র‍্যামসে আরেক নিষ্ক্রিয় গ্যাস আর্গন আবিষ্কার করেন।আর্গন হলো প্রথম আবিষ্কৃত নিষ্ক্রিয় গ্যাস।১৮৯৫ সালে তিনি একটি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ পড়লেন যেখানে একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের অস্তিত্বের কথা বলা ছিল।ইউরেনিয়ামের একটি আকরিক ইউরেনাইনাইটে (uraninite) এসিড যোগ করা হলে গ্যাসটি নির্গত হত।র‍্যামসে ভেবেছিলেন গ্যাসটি বোধহয় আর্গন।তিনি ইউরেনিয়ামের আরেকটি আকরিক ক্লেভেইট (cleveite) একইভাবে পরীক্ষা করে দেখতে পেলেন গ্যাসটিতে রয়েছে নাইট্রোজেন, আর্গন ও একটি অজানা গ্যাস।পরবর্তীতে দেখা গেল এই অজানা গ্যাসটির বর্ণালি রেখা সূর্যতে পাওয়া সেই অজানা গ্যাসটির বর্ণালি রেখার সাথে পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে।স্বীকৃতি পেল হিলিয়াম।এভাবে পৃথিবীতেও তার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হলো।পর্যায় সারণিতে একটি নতুন মৌল সগৌরবে তার জায়গা করে নিল।

হিলিয়াম সম্পর্কে কিছু মজার তথ্য:

- হিলিয়াম এতটাই হালকা যে আমাদের পৃথিবীর মহাকর্ষ বল একে ধরে রাখার মত শক্তিশালী না।আর তাই হিলিয়াম একবার যখন বাতাসে উন্মুক্ত হয়, ধীরে ধীরে মহাশূন্যের পথে পাড়ি জমায় সে।
- হিলিয়াম হলো সবচেয়ে কম গলনাংক বিশিষ্ট মৌল।

সাধারণ বায়ুচাপে হিলিয়ামকে কঠিন পদার্থে পরিণত করা যায় না।কক্ষতাপমাত্রায় হিলিয়ামকে কঠিন পদার্থে পরিণত করার জন্য প্রয়োজন ১১৪ হাজার এটমোস্ফিয়ার বায়ুচাপ, যা সমুদ্রের গভীরতম বিন্দু, চ্যালেঞ্জার ডিপের (Challenger Deep) চাপের চেয়ে ১০০০ গুণ বেশি!

- পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এটি খুব অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়।হিলিয়াম খুব হালকা হওয়ায় আগে ভাবা হত পৃথিবী থেকে খুব দ্রুত বুঝি এটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।কিন্তু বর্তমানে আমরা জানি পৃথিবীতে এর কিছু স্থায়ী উৎস রয়েছে যা থেকে ধারণাতীত পরিমাণের হিলিয়াম পাওয়া যেতে পারে।
- হিলিয়ামের প্রধান উৎস হলো ভারী তেজস্ক্রিয় মৌল (যেমন, ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম) থেকে ক্রমাগত নির্গত হওয়া তেজস্ক্রিয় বিকিরণ। এই মৌলগুলো থেকে আলফা রশ্মি বিকিরণের মাধ্যমে হিলিয়াম তৈরি হয় ও তা প্রাকৃতিক গ্যাসের সাথে মিশে জমা হয়।পরবর্তীতে আংশিক পাতনের মাধ্যমে হিলিয়ামকে প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে আলাদা করা হয়।

হিলিয়ামের আরেকটি উৎস হলো আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের মাধ্যমে নির্গত হওয়া পৃথিবীর জন্মের সময়কার আদি হিলিয়াম।

সূর্যতে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৫৯৬ মিলিয়ন হিলিয়াম তৈরি হয়ে থাকে।

সুপারফ্লুইড হিলিয়াম:

হিলিয়ামকে তরলে পরিণত করা খুব কঠিন।পরম শূন্য তাপমাত্রার কাছাকাছি তাপমাত্রাতে হিলিয়াম এমন এক তরলে ঘনীভূত হয় যা সুপারফ্লুইডের মতো চমৎকার কিছু বৈশিষ্ট্য দেখায়। হিলিয়ামের বেশিরভাগ ব্যবহার লিকুইড হিলিয়াম হিসেবেই হয়ে থাকে।

১৯১১ সালে একজন ডাচ-জার্মান বিজ্ঞানী লিকুইড হিলিয়ামের সাহায্যে পারদকে ঠাণ্ডা করছিলেন।তিনি হঠাৎ আবিষ্কার করলেন -৪৫২° ফারেনহাইটের নিচে সিস্টেমটি তার সব বৈদ্যুতিক রোধ হারিয়ে একটি আদর্শ পরিবাহীতে পরিণত হয়।এটা যেন কোনো আইপডকে শূন্যেরও একশো ডিগ্রি নিচে ঠাণ্ডা করে আবিষ্কার করা যে এটা যতক্ষণই চলুক না কেন এর ব্যাটারি কিছুতেই চার্জ হারাচ্ছে না।ব্যাটারি ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ চার্জিত অবস্থায় থাকবে যতক্ষণ হিলিয়াম এর সার্কিটকে ঠাণ্ডা রাখবে।

একটি রাশিয়ান-কানাডিয়ান টিম ১৯৩৭ সালে পিওর হিলিয়ামের আরেকটি অত্যন্ত চমৎকার বৈশিষ্ট্য সুপারফ্লুইডিটি (superfluidity) আবিষ্কার করেন।তারা দেখতে পেলেন হিলিয়ামকে -৪৫৬ ডিগ্রি ফারেনহাইটে (২.১৭ কেলভিন) ঠাণ্ডা করা হলে এটি একটি সুপারফ্লুইডে পরিণত হয় যার বৈশিষ্ট্য হলো একদম শূন্য সান্দ্রতা (zero viscosity), শূন্য ঘর্ষন (zero friction) আর সম্পূর্ণ শূন্য বাধাসম্পন্ন প্রবাহী (zero resistance), যেটাকে বলা যায় একেবারে পার্ফেক্ট ফ্লুইডনেস।সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হলো সুপারফ্লুইড হিলিয়াম মহাকর্ষ বলকে পর্যন্ত মেনে চলে না, অর্থাৎ সুপারফ্লুইড হিলিয়াম দেওয়াল বেয়ে উপরে উঠতে পারে!

হিলিয়াম
জ্যোতিরসায়ন

ChemFusion
www.chemfusion.net

হিলিয়ামের ব্যবহার:

ছোটবেলার শখের বেলুনে ছাড়াও হিলিয়ামের রয়েছে উল্লেখযোগ্য ব্যবহার-

- হিলিয়ামের প্রধান ব্যবহার হলো MRI (Magnetic Resonance Imaging) - এ।মেশিনটির অতিপরিবাহী (superconducting) চুম্বকগুলোকে ঠাণ্ডা রাখার জন্য তরল হিলিয়াম ব্যবহার করা হয়॥
- দ্রুতগতির ম্যাগলেভ ট্রেইনের চুম্বককে ঠাণ্ডা রাখার জন্যেও তরল হিলিয়াম ব্যবহার করা হয়ে থাকে।
- নিষ্ক্রিয়তার জন্য সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে হিলিয়াম ব্যবহার করা হয়।সেখানে এটি মূলত সিলিকন ও জার্মেনিয়ামের ক্রিস্টাল তৈরির জন্য নিষ্ক্রিয় পরিবেশ তৈরিতে সাহায্য করে।
- এছাড়াও ওয়েল্ডিং এ, টাইটেনিয়াম ও জিরকোনিয়াম তৈরিতে এবং গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফিতে বাহক গ্যাস হিসেবেও এর ব্যবহার রয়েছে।

হিলিয়ামের আইসোটোপ:

হিলিয়ামের ৮ টি আইসোটোপ রয়েছে যাদের ভর সংখ্যা ৩ থেকে ১০ এর মধ্যে।এগুলোর মধ্যে প্রকৃতিতে দুটি স্থায়ী আইসোটোপ পাওয়া যায় - 3He, ও 4He যাদের পরিমাণ যথাক্রমে ০.০০০১% ও ৯৯.৯৯৯%।

শেষ কথা:

আমাদের এই মহাবিশ্বের ৯০% কণা হলো হাইড্রোজেন আর বাকি ১০% হলো হিলিয়াম।হিলিয়াম- একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস, তারাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ।ভবিষ্যতে এর সুপারফ্লুইডিটি ও অন্যান্য অসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোকে কাজে লাগিয়ে রসায়ন ও বিজ্ঞান জগতে আরও অনেক অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসবে এই আশাই করি।

ক্রিসেন্ট নেবুলা ও হিলিয়াম

নেবুলা হলো ধূলিকণা, হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ও অন্যান্য আয়নিত গ্যাসের আন্তঃনাক্ষত্রিক বিশাল মেঘ।ক্রিসেন্ট নেবুলা তেমনই এক উজ্জ্বল নেবুলা।এর অবস্থান পৃথিবী থেকে ৫০০০ আলোকবর্ষ দূরে।নেবুলাটি এতই বিশাল যে আমাদের সৌরজগতের মতো সাতটি সৌরজগতকে এখানে অনায়াসে রাখা যাবে! ক্রিসেন্ট নেবুলার এই উজ্জ্বল আলোর তার কেন্দ্রে অবস্থিত এক অতি উত্তপ্ত তারা, যার নাম WR-136।

WR-136 আমাদের সূর্যের চেয়েও ১৫ গুণ ভারি এবং ২,৫০,০০০ গুণ উজ্জ্বল তারা।এই অবিশ্বাস্য শক্তি তারাটি পায় তার জ্বালানি- হিলিয়াম থেকে।

হিলিয়ামের কারণেই WR-136 এত উত্তপ্ত ও এত উজ্জ্বল।তারাটি একসময় হাইড্রোজেন পুড়িয়ে জ্বলত, ঠিক আমাদের সূর্যের মত।ধীরে ধীরে হাইড্রোজেন পরমাণুগুলো তারাটির কেন্দ্রে প্রচণ্ড চাপে হিলিয়াম পরমাণুতে পরিণত হয়।আর এর ফলে নির্গত হয় প্রচণ্ড শক্তি।

কিন্তু প্রায় ২,০০,০০০ বছর আগে তারাটির জ্বালানি হাইড্রোজেন শেষ হয়ে যায়।এরপর এটি হাইড্রোজেনের পরিবর্তে হিলিয়াম অণুগুলোকে প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করতে শুরু করে এবং ক্রমাগত বড় হয়ে চারিদিকে গ্যাসের মেঘ নির্গত করে একটি দৈত্যাকার লাল তারায় পরিণত হয়।

তারাটি প্রতিনিয়ত বিদ্যুতায়িত গ্যাসের এক বাতাস উৎপন্ন করছে যার বেগ প্রতি সেকেন্ডে ১,৭০০ কিলোমিটার! এই বাতাসের সাথে তারাটি দ্বারা নির্গত গ্যাসের মেঘের সংঘর্ষ ঘটে, যার কারণে নেবুলাটিকে আমরা জ্বলন্ত অবস্থায় দেখতে পাই।

অন্যান্য তারাদের মত WR-136-ও একসময় হিলিয়াম ও অন্যান্য জ্বালানি নিঃশেষ করে ফেলবে এবং শেষ পর্যন্ত সুপারনোভা বিস্ফোরণের মতো এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের মাধ্যমে বিশাল আগুনের গোলকে পরিণত হবে।

সৌরজগতের রসায়ন

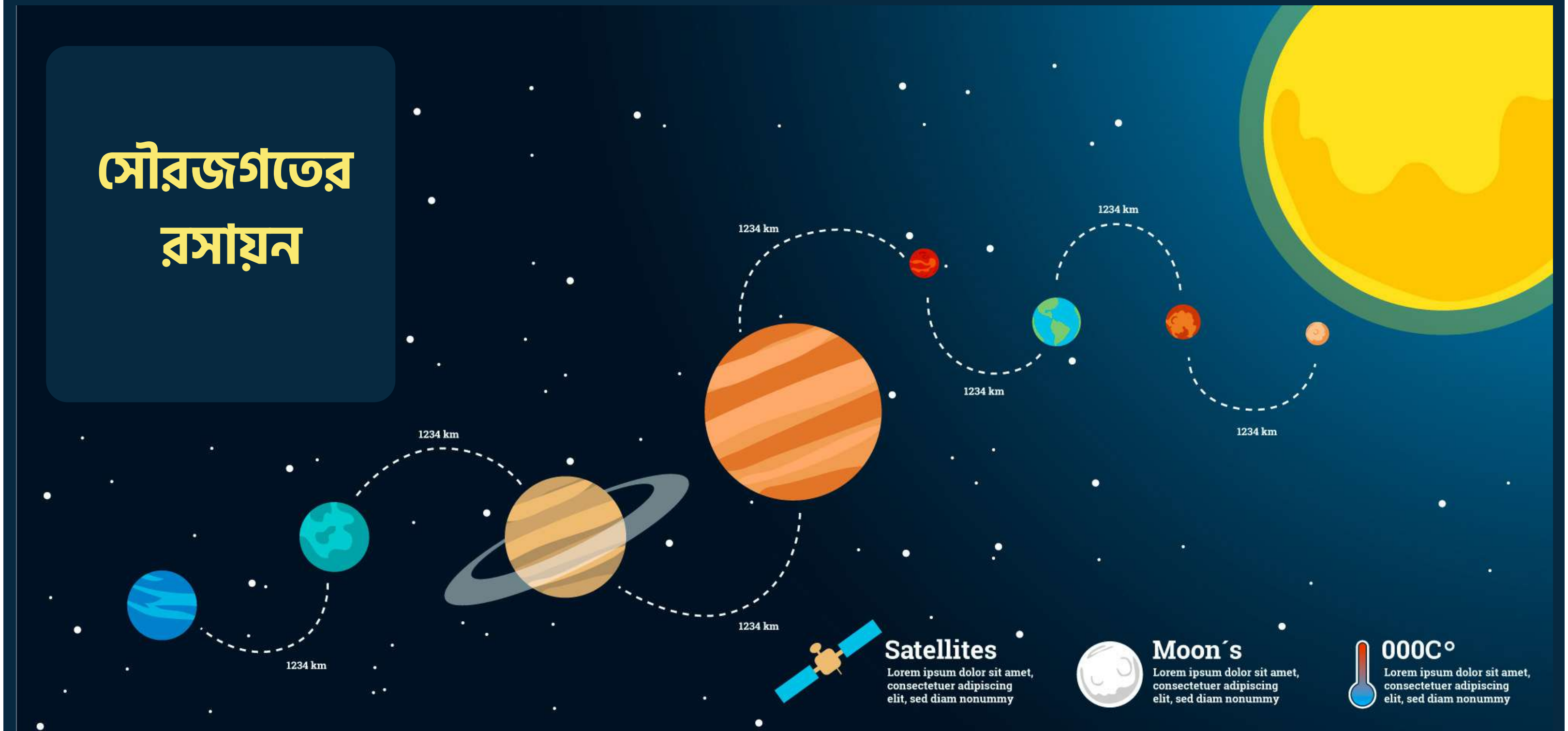

Mercury	Venus	Earth	Mars	Jupiter	Saturn	Uranus	Neptune
আণবিক অক্সিজেন সোডিয়াম হাইড্রোজেন	কার্বন ডাই অক্সাইড নাইট্রোজেন	অক্সিজেন নাইট্রোজেন	কার্বন ডাই অক্সাইড আর্গন	হাইড্রোজেন হিলিয়াম	হাইড্রোজেন হিলিয়াম		

ছিলিয়াম
জ্যোতিরসায়ন

সৌরজগতের রসায়ন

ChemFusion
www.chemfusion.net

রসায়নের কথা ভাবলেই চোখে ভাসে এপ্রোন, মাস্ক, গগলস পড়া বিজ্ঞানীদের কথা, যারা ল্যাবরেটরিতে কাজ করছেন বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি নিয়ে।
কিন্তু কখনো কি ভেবেছেন, বাসার ছাদে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়েও লক্ষ মাইল দূরের মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্র- নীহারিকাপুঞ্জে অনেকে খুঁজে ফিরছেন রাসায়নিক রহস্য?
মহাকাশযাত্রায় বিভিন্ন সময়ে নভোচারীরা সন্ধান পেয়েছেন বিভিন্ন গ্যাসের এমনকি কখনো কখনো গানপাউডারের বিশেষ গন্ধের!! এসবের জন্য অবশ্যই কোনো না কোনো রাসায়নিক পদার্থই দায়ী।তাছাড়া সৌরজগতের সকল গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রগুলোর গঠনেও পাওয়া গিয়েছে বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানের উপস্থিতি।

'জ্যোতিরসায়ন' ।
বাংলা একাডেমির অভিধানে এই শব্দটা এখন পর্যন্ত যোগ করা হয়নি।বাংলাতে এই শব্দটার ব্যবহার আমি অন্তত দেখিনি আজ পর্যন্ত।

তা আসলে জ্যোতিরসায়ন কি ?

এককথায় বলতে সৌরজগতের রসায়ন।

সৌরজগতের যত গ্রহ উপগ্রহ আছে , সবগুলোতেই কিছু না কিছু রসায়ন থাকেই , সূর্যে যেমন ফিউশন বিক্রিয়া চলে, ভেনাস এ আছে মিথেনের বায়ুমণ্ডল , পৃথিবীতে আছে অক্সিজেন। এই রসায়নগুলো নিয়ে কাজ করাই একজন রসায়নবিদের কাজ। কিংবা মঙ্গলে বসবাসের জন্য কিরকম রাসায়নিক ব্যবস্থা থাকা লাগবে, আদৌ কি তা সম্ভব? এসব প্রশ্ন বিশ্লেষণ আর উত্তর খোঁজার কাজটা করে জ্যোতিরসায়নবিদরা।এইতো কিছুদিন আগেই মঙ্গলে পাঠানো হয়েছিল 'Perseverance Rover ' । বলতে গেলে একটা আস্ত রসায়নগার ই পাঠানো হয়েছে সেখানে, পাঠানো হয়েছে MOXIE নামে অক্সিজেন উৎপাদনকারী যন্ত্রবিশেষ। এদিকে শুক্রে উড়ন্ত রাসায়নিক গবেষণাগার পাঠানোর চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত বিজ্ঞানীরা,শনি গ্রহের চাঁদ টাইটানের মাটি স্পর্শ করেছে হাইজিন্স রোভার - দেখেছে মিথেনের নদী, মিথেনের বৃষ্টি। এভাবেই পৃথিবীর বাইরেও মানবজাতির কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে রসায়ন। এলিয়েনরা আমাদের রসায়নবিদদের দেখে একটু আফসোস করতেই পারে ।

যাকগে সূচনা আর লম্বা করতে চাইনা একদম (অনেকখানি ই করে ফেলেছি) এবার প্রত্যেকটা গ্রহের রসায়ন আলাদাভাবে জানবো।

ছিলিয়াম
জ্যোতিরসায়ন

ChemFusion
www.chemfusion.net

সূর্য

সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থিত সবচেয়ে বড় নক্ষত্র হলো সূর্য।সূর্যের ভর প্রায় ২×১০^৩০ কিলোগ্রাম যা সৌরজগতের মোট ভরের ৯৯.৮ শতাংশ, ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় ১০৯ গুণ বেশি- অর্থাৎ প্রায় দশ মিলিয়ন পৃথিবী সূর্যের ভেতর দিব্যি এঁটে যাবে!!

সূর্যের দৃশ্যমান অংশের তাপমাত্রা প্রায় ১০,০০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট আর মূল অংশের তাপমাত্রা পারমাণবিক বিক্রিয়ার দরুন ২৭ মিলিয়ন ফারেনহাইটের বেশি পৌঁছায়।নাসার মতে সূর্যে উৎপন্ন শক্তির সাথে প্রতি সেকেন্ডে ১০০ বিলিয়ন টন ডায়নামাইট বিস্ফোরণের তুলনা করা যায়।

সূর্য সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমেই জানতে হবে তার গাঠনিক উপাদান সম্পর্কে।সূর্যের প্রধান গাঠনিক উপাদান হাইড্রোজেন, আসলে মোট ভরের তিন চতুর্থাংশই হাইড্রোজেন।হাইড্রোজেনের পরেই সবচেয়ে প্রাচুর্য্যময় মৌল হিলিয়াম।হিলিয়ামের চেয়ে ভারী মৌল সূর্যের মাত্র ১.৬৯% ভরের জন্য দায়ী, তারপরও এদের সম্মিলিত ভর পৃথিবীর ভরের ৫,৬২৮ গুণ।এই ভারী মৌলগুলোর মধ্যে রয়েছে অক্সিজেন, কার্বন, নিয়ন, লোহা ইত্যাদি।

আচ্ছা এবার প্রশ্ন হতে পারে সূর্য থেকে কোটি কোটি মাইল দূরে বসে বিজ্ঞানীরা কিভাবে জানলেন সেখানে হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম আছে? গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বৈকি!

আসুন জেনে নেই পুরো প্রক্রিয়াটি

হাইড্রোজেন , হিলিয়াম , নিয়ন , সোডিয়াম কিংবা মার্কারী সবারই নির্দিষ্ট ইমিশন স্পেকট্রা (Emission Spectra) রয়েছে ।মূলত এই স্পেকট্রার সাথেই মিলিয়ে নির্ধারণ করা হয় কোন গ্রহে কোন পদার্থ বিদ্যমান এবং তার পরিমাণ কতটুকু।

সূর্যে ভারী মৌলিক পদার্থের পরিমাণ বেশী।সূর্যের কেন্দ্র থেকে শুরু করে মোট ব্যাসার্ধের শতকরা ২০-২৫ ভাগ পর্যন্ত যে অঞ্চলটি রয়েছে তার নাম কোর বা কেন্দ্রভাগ।এই অঞ্চলের ঘনত্ব ১৫০ গ্রাম/ঘনসেন্টিমিটার (পানির ঘনত্বের ১৫০ গুণ) এবং তাপমাত্রা প্রায় ১ কোটি ৩৬ লক্ষ কেলভিন।অথচ সূর্যের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা মাত্র ৫৮০০ ডিগ্রি কেলভিন।সোহো (The Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) is a spacecraft built by a European industrial consortium led by Matra Marconi Space (now Airbus Defence and Space) that was launched on a Lockheed Martin Atlas II AS launch vehicle on December 2, 1995, to study the Sun. It has also discovered over 4,000 comets.) মহাকাশ মিশন থেকে পাওয়া তথ্য বলছে, সূর্যের কেন্দ্রভাগে ঘূর্ণন বেগ বিকিরণ অঞ্চলের অন্যান্য স্থানের তুলনায় বেশি।এই অঞ্চলে প্রোটন প্রোটন শিকলের মাধ্যমে হাইড্রোজেন সংযোজনের (ফিউশন) মাধ্যমে হিলিয়াম তৈরি হয়।

ChemFusion
www.chemfusion.net

এটিই সূর্যের শক্তির প্রধান উৎস।সূর্যে উৎপাদিত মোট হিলিয়ামের শতকরা মাত্র ২ ভাগ সিএনও(The 'CNO cycle' refers to the Carbon-Nitrogen-Oxygen cycle, a process of stellar nucleosynthesis in which stars on the Main Sequence fuse hydrogen into helium via a six-stage sequence of reactions.) চক্র থেকে আসে।

কেন্দ্রভাগে সূর্যের মোট শক্তির প্রায় পুরোটাই উৎপাদিত হয়।ব্যাসার্ধ্যের ২৪% এর মধ্যে ফিউশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে সূর্যের মোট শক্তির শতকরা ৯৯ ভাগ উৎপাদিত হয়, ৩০% এর পর আর কোন ফিউশন বিক্রিয়া দেখাই যায় না।সুতরাং সূর্যের বাকি অংশ কেন্দ্রভাগের শক্তি দিয়েই চলে, কেন্দ্রভাগ থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় শক্তি বাইরের স্তরগুলোর দিকে প্রবাহিত হয়।অনেকগুলো স্তর ভেদ করে অবশেষে এই শক্তি আলোকমণ্ডলে পৌঁছায়, এরপর পদার্থ কণার গতিশক্তি বা সূর্যালোক হিসেবে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রতি সেকেন্ডে ৯.২×১০^৩৭ টি প্রোটন-প্রোটন শিকল বিক্রিয়া ঘটে।প্রতিটি বিক্রিয়ায় যেহেতু ৪টি হাইড্রোজেন মিলে একটি হিলিয়াম তৈরি হয় সেহেতু বলা যায়, প্রতি সেকেন্ডে সূর্য ৩.৭×১০^৩৮ টি প্রোটনকে (প্রায় ৬.২×১০^১১ কিলোগ্রাম) আলফা কণা তথা হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে রূপান্তরিত করে।সূর্যে মোট মুক্ত প্রোটনের সংখ্যা প্রায় ৮.৯×১০^৫৬ টি।হাইড্রোজেনের সংযোজন বিক্রিয়ার মাধ্যমে সংযোজিত ভরের শতকরা ০.৭ ভাগ শক্তিতে পরিণত হয়।হিসাব করলে দেখা যায় ভর-শক্তি রূপান্তরের মাধ্যমে সূর্যে প্রতি সেকেন্ডে ৪২ লক্ষ মেট্রিক টন শক্তি বিমুক্ত হয়। আইনস্টাইনের ভর-শক্তি সংরক্ষণশীলতা নীতি অনুযায়ী এই ভর ধ্বংস হয় না বরং শক্তিতে রূপান্তরিত হয় যা বিকিরণ হিসেবে মহাশূন্য ছড়িয়ে পড়ে।

কেন্দ্রভাগের সংযোজন বিক্রিয়া এমন এক সাম্যাবস্থায় আছে যে বিক্রিয়ার হার যদি একটু বেড়ে যায় তাহলে কেন্দ্রভাগ উত্তপ্ত হয়ে সম্প্রসারিত হতে শুরু করে, এতে গ্যাসের ঘনত্ব কমে যায়, বিক্রিয়া হারও কমে যায়।আবার বিক্রিয়ার হার স্বাভাবিকের চেয়ে কমে গেলে কেন্দ্রভাগ সামান্য সংকুচিত হয়ে গ্যাসের ঘনত্ব বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে বিক্রিয়ার হার আবার বেড়ে যায়।এভাবেই সাম্যাবস্থা রক্ষিত হয়।

বিক্রিয়ায় যেসব উচ্চ শক্তির গামা রশ্মি উৎপন্ন হয় তারা বিকিরিত হওয়ার মাত্র কয়েক মিলিমিটারের মধ্যেই সৌর প্লাজমা দ্বারা আবার শোষিত হয়, এরপর সামান্য নিম্ন শক্তিতে আবার বিকিরিত হয়।এভাবে বিকিরিণ-শোষণের খেলা চলতেই থাকে।এজন্যই সূর্যের কেন্দ্র থেকে পৃষ্ঠে শক্তি পৌঁছুতো অনেক সময় লাগে।কেন্দ্র থেকে পৃষ্ঠে ফোটনের আসতে প্রায় ১০,০০০ থেকে ১৭০,০০০ বছর লাগে বলে অনুমান করা হয়।

বুধ

সৌরজগতেরগতের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম এবং সূর্যের সর্বাপেক্ষা নিকটতম গ্রহ।সকাল এবং সন্ধ্যায় ক্ষীণ আলোতে আমাদের চোখে ধরা দেয় বুধ।

সৌরপরিবারের কনিষ্ঠতম এই সদস্যের সম্পর্কে পৃথিবী জানতে শুরু করে নভোযান মেরিনার-১০ এর অভিযানের মাধ্যমে।মেরিনার-১০ এর অনুসন্ধানী অভিযানের ধারাবাহিকতায় ২০০৪-২০১৫ সাল পর্যন্ত বুধের বুকে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে দীর্ঘ অনুসন্ধান চালায় "messenger" বুধের উপরিভাগ এবং এর ক্রাস্ট-কোরের গঠন সম্পর্কে নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সফলভাবে উদঘাটনের কৃতিত্ব এই অভিযানের।

সূর্যের সবচেয়ে নিকটতম হওয়ায় দাবদাহে উত্তপ্ত থাকে বুধের উপরিভাগ।এতটাই উত্তপ্ত যে লৌহ অনায়াসেই গলে যায়।বায়ুমন্ডলের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে।তবে এর উত্তর গোলার্ধ আবার হিমশীতল।
মেসেঞ্জার স্পেসক্রাফট এক্স রশ্মি,গামা রশ্মি এবং নিউট্রন স্পেক্ট্রোমিটারের সাহায্য বুধের রাসায়নিক গঠন নীরিক্ষার প্রচেষ্টা চালায়।আর এই পরীক্ষার ফলাফল থেকে বুধের বুকে উদ্বায়ী সোডিয়াম,সালফার,থোরিয়াম,ক্লোরিন,পটাশিয়াম প্রভৃতি উপাদানের ব্যাপক উপস্থিতি প্রমাণ হয়।পূর্বে লৌহের উপস্থিতি ব্যাপক থাকতে পারে বলে ধারণা করা হলেও মেসেঞ্জারের পরীক্ষা সেই ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে।এই পরীক্ষালব্ধ ফলাফল একই সাথে প্রমাণ করে অত্যধিক তাপমাত্রায়ও উদ্বায়ী উপাদানের প্রাচুর্য থাকতে পারে ।একই সাথে বুধের সৃষ্টিকালীন পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনেক টা রিডিউসিং ছিল সেই দিকেও আলোকপাত করে।
ভূরাসায়নিক এবং পেট্রোলজিক্যাল নীরিক্ষা থেকে এই গ্রহের কোর সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

বুধের অন্তর্গঠনের বা কোর অংশে Fe,Si এর প্রাচুর্য রয়েছে।অন্তর্গঠন অপরাপর গ্রহের মতোই -কোন বৈচিতর্য্ নেই।Si উপস্থিত থাকে সিলিকেট হিসাবে যার গঠন অনেক টাই enstatite($MgSiO_3$) এর মতো।

মঙ্গল

মঙ্গল গ্রহ "রেড প্ল্যানেট" নামে পরিচিত।কারণ এর পৃষ্ঠে বিদ্যমান আয়রন অক্সাইডের প্রভাব, যার জন্য এটি খালি চোখে দেখলে মধ্যে লালচে বর্ণ দেখায়।মঙ্গল গ্রহটি একটি পাতলা বায়ুমণ্ডল সহ স্থলজগতের গ্রহ, যা পৃথিবীর চাঁদ এবং উপত্যকাসমূহ, মরুভূমি এবং মেরু বরফ ক্যাপগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়।

মঙ্গল গ্রহ পরিচিত এর উজ্জ্বল মরিচা রঙের জন্য।এটি মূলত এতে উপস্থিত আয়রন সমৃদ্ধ খনিজের কারণে - তার পৃষ্ঠটি আলগা ধূলিকণা এবং শিলা ছড়ানো ।জৈব উপাদানের আধিক্য থাকলেও এ গ্রহে পৃথিবীর মাটি এক ধরণের নিয়ামক।নাসার মতে আয়রন খনিজগুলোর জারণের কারণে মরিচা উৎপন্ন হয়, যার ফলে মাটি লাল দেখা যায়।

ঠান্ডা, পাতলা বায়ুমণ্ডল ইঙ্গিত দেয় যে, তরল জল সম্ভবত দীর্ঘ সময় ধরে মঙ্গলের পৃষ্ঠে থাকতে পারে না।কিছু রৈখিক বৈশিষ্ট্যের পুনরাবৃত্তি তৎসংশ্লিষ্ট অঞ্চল দিয়ে পানির প্রবাহের প্রমাণ দেয়, তবে এই প্রমাণটি বিতর্কিত; অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে, এই অঞ্চলে কক্ষপথে হাইড্রোজেনের পরিবর্তে বিভিন্ন উজ্জ্বল লবণ উপস্থিত থাকতে পারে।এর অর্থ হলো যদিও এই মরুভূমিটির ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের অর্ধেক, তবে এটি একই পরিমাণ শুকনো। বিজ্ঞানীরা মনে করেন এই গ্রহের পৃষ্ঠের অধিকাংশই তৈরি হয়েছিল ভ্যালস মেরিনারিগুলোর সম্প্রসারণের সময়। এর মধ্যে প্রত্যেকটি পৃথক উপত্যকা প্রায় ৬০ মাইল প্রশস্ত।গিরিখাতগুলো (Canyons) ভেলস মেরিনারিসের কেন্দ্রীয় অংশে মিশে যায় এবং সেগুলো প্রত্যেকটি প্রায় ৩৭০ মাইল পর্যন্ত প্রশস্ত।গিরিখাত এবং স্তরযুক্ত পললের প্রান্ত থেকে উত্থিত বড় চ্যানেলগুলো ইঙ্গিত করে যে, উপত্যকাগুলো একেবারে তরল জলে ভরে উঠতে পারে।

মঙ্গল গ্রহে সৌরজগতের বৃহত্তম আগ্নেয়গিরি রয়েছে, অলিম্পাস মনস যার মধ্যে অন্যতম।এই বিশাল আগ্নেয়গিরি প্রায় ৩০০ মাইল ব্যাসের যার প্রশস্ততা নিউ মেক্সিকো রাজ্যের চেয়ে বেশি।অলিম্পাস মনস মূলত হাওয়াই আগ্নেয়গিরির মতোই উত্থিত হয় যা দীর্ঘ সময় ধরে প্রবাহিত লাভার অগ্ন্যুৎপাতের ফলে তৈরি হয়েছিল।মঙ্গলে ছোট-বড় আরও অনেক ধরণের আগ্নেয় জলাভূমি রয়েছে।কিছু ছোটখাটো বিস্ফোরণ গ্রহে এখনো ঘটতে পারে।

ChemFusion
www.chemfusion.net

লাল গ্রহে অক্সিজেন উৎপাদন

'মঙ্গল' বা 'লাল গ্রহ' নামে পরিচিত এই গ্রহটিকে একসময় বিজ্ঞানীরা মানুষের জন্য অবাসযোগ্য হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন।কেননা এর বায়ুমন্ডলের ৯৫.৯৭% ই কার্বন ডাই অক্সাইড এবং মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য অক্সিজেন এর পরিমাণ মাত্র ০.১৪৬% যা কিনা পৃথিবীর তুলনায় খুবই কম।এমন পরিবেশে মানুষের বেঁচে থাকা অসম্ভব।

কিন্তু সম্প্রতি নাসার রোভার পারসিভারেন্সের মক্সি একটা দূর্দান্ত কাজ করে ফেলে।মক্সি, মঙ্গলের বায়ুমন্ডলে থাকা কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে অক্সিজেন উৎপাদন করতে সক্ষম হয়।নাসার মঙ্গলে পাঠানো এই রোভার পারসিভারেন্সকে মঙ্গলের একটি রসায়নাগার বিবেচনা করা যায়, যার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো মক্সি।

মক্সি (দ্যা মার্স অক্সিজেন ইন-সিটু রিসোর্স ইউটিলাইজেশন এক্সপেরিমেন্ট) এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো মঙ্গলে অক্সিজেন উৎপাদন।মাত্র ১৭.১ কেজি ভরের এবং পারসিভারেন্সের সাথে যুক্ত এই পরীক্ষামূলক উপকরণটি দেখতে পাউরুটি সেঁকার একটি যন্ত্রের মতো।

গত ১৮ ফেব্রুয়ারী নাসার রোভার পারসিভারেন্স মঙ্গলে অবতরণ করে এবং ২০ এপ্রিল মক্সি অক্সিজেন উৎপাদন করতে সক্ষম হয়।শুরুতে, মক্সি প্রত্যেক ঘন্টায় ৬ গ্রাম অক্সিজেন উৎপাদন শুরু করলেও যন্ত্রটির অবস্থা নির্ণয় করতে গিয়ে দুইবার এর উৎপাদন মাত্রা হ্রাস পায়।অবশেষে এক ঘন্টা অপারেশন এর পরে মক্সি থেকে উৎপাদিত অক্সিজেনের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৫.৪ গ্রাম যা মঙ্গলে একজন নভোচারীকে ১০ মিনিট স্বাচ্ছন্দ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণে সাহায্য করবে।

এক্ষেত্রে মক্সি মঙ্গলের বায়ুমন্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইড ভেঙে এর শুধু অক্সিজেন অংশ রেখে দেয় এবং অবশিষ্ট কার্বন মনোক্সাইডকে বায়ুমন্ডলে ছেড়ে দেয়।এই প্রক্রিয়ায় উচ্চ তাপমাত্রা প্রয়োগ করতে হয়, যার পরিমাণ প্রায় ১৪৭০ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৮০০° সেলসিয়াস।এত উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করতে তাই মক্সিকে উচ্চ তাপ সহনশীল উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।যাদের মধ্যে থ্রিডি প্রিন্টেড নিকেল সংকরণ অন্যতম, যেটি কিনা এর মধ্যে দিয়ে চলমান গ্যাস প্রবাহকে উষ্ণ বা শীতল করতে সক্ষম।এছাড়া রয়েছে হালকা ভরের এরোজেল যা তাপ ধরে রাখতে সাহায্য করে। মোক্সির বাইরের দিকে একটি পাতলা সোনার আবরণ দেওয়া হয়েছে যা এর ভেতর থেকে ইনফ্রারেড তাপ বেরিয়ে আসতে বাধা প্রদান করার মাধ্যমে পারসিভারেন্সের অন্যান্য অংশগুলোকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে।

এই অপারেশনে মক্সি মাত্র ৫.৪ গ্রাম অক্সিজেন উৎপাদন করলেও এটি মূলত ১০ গ্রাম অক্সিজেন উৎপাদনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।তবে এই ৫.৪ গ্রামও কম কথা নয়! বরং এটি নাসার বিজ্ঞানীদের আরও বেশি পরিমাণে অক্সিজেন উৎপাদনের স্বপ্ন দেখতে সাহস যুগিয়েছে।তারা আশাবাদী যে মঙ্গলের এক বছরে (পৃথিবীর হিসেবে প্রায় দুই বছর) মক্সি আরও নয়বার অক্সিজেন উৎপাদনে সক্ষম হবে।

এইতো গেলো নাসার গবেষণার সাফল্যের কথা, কিন্তু কি এমন প্রয়োজনীয়তা তাদের এই গবেষণার দিকে ঠেলে দিয়েছে এবার তা জানা যাক।

সাধারণত নভোচারীরা মহাশূন্যের যেকোনো স্থানে গমনের সময় প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সাথে নিয়ে যান।কিন্তু মক্সি যদি প্রয়োজনীয় অক্সিজেন উৎপাদন করতে পারে তাহলে মঙ্গলে এই বাড়তি অক্সিজেন বয়ে নিয়ে যাওয়ার ভোগান্তি পোহাতে হবে না।

এছাড়া রকেটের প্রপেলেন্ট গঠিত হয় জ্বালানি ও অক্সিডাইজার নিয়ে।এই অক্সিডাইজার হিসেবে অক্সিজেন ব্যবহার করা যায়।অর্থাৎ, রকেটের চালিকাশক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ অক্সিজেন আমরা পেয়ে যাচ্ছি মক্সি থেকে! আর এই অক্সিজেন ব্যবহার করেই মঙ্গল থেকে আবার পৃথিবীটিতে রকেটটি ফিরে আসতে সক্ষম হবে।তাছাড়া চাইলে এই অক্সিজেন ব্যবহার করে মঙ্গলের মাটি থেকে আরও দূরবর্তী গ্রহ বা নক্ষত্রে রকেট পাঠানো সক্ষম হবে।

নাসার জেট প্রপালেশনের গবেষক, হেক্ট বলেছেন, "রকেট প্রেরণের ক্ষেত্রে এর জ্বালানি দহনের জন্য এর ভরের চেয়ে বেশি পরিমাণ অক্সিজেন প্রয়োজন।ভবিষ্যতে চারজন নভোচারীকে মঙ্গলে পাঠাতে চাইলে ৭ মেট্রিক টন রকেট জ্বালানি এবং ২৫ মেট্রিক টন অক্সিজেন প্রয়োজন হবে।এছাড়া মঙ্গলে থাকাকালীন অক্সিজেন ত লাগবেই।এই চারজন নভোচারী এক বছর মঙ্গলে থাকতে চাইলে তাদের অবশ্যই এক মেট্রিক টন অক্সিজেন প্রয়োজন হবে।
পৃথিবী থেকে ২৫ মেট্রিক টন অক্সিজেন এই লাল গ্রহে নিয়ে যাওয়া অনেক কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়বহুলও বটে!
তাই মক্সিকে আরও উন্নত করে ২৫ টন অক্সিজেন উৎপাদনের ব্যবস্থা করাটা অবশ্যই একটি উপযোগী এবং সাশ্রয়ী উপায়।

মক্সির অক্সিজেন উৎপাদনের মাধ্যমেই পারসিভারেন্সের কাজ শেষ নয়।বরং এটি মঙ্গলে প্রাচীন অণুজীবের চিহ্ন এবং বর্তমানের প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজে বেড়াচ্ছে।এছাড়াও মানুষের জন্য বাসযোগ্য করে তুলতে মঙ্গলের ভূতাত্ত্বিক এবং জলবায়ু গবেষণা অব্যাহত রয়েছে।তাছাড়া মঙ্গলের উপাদান থেকেই ব্যবহারযোগ্য উপাদান যেমন হাইড্রোজেন, পানি তৈরীর চেষ্টা চলছে।

তবে এটা মানতেই হবে যে মক্সির অক্সিজেন উৎপাদন শুধু মঙ্গল না বরং অন্যান্য গ্রহেও অক্সিজেন উৎপাদনে গবেষকদের আশাবাদী করে তুলেছে।অর্থাৎ, এটি জ্যোতির্বিজ্ঞানে নতুন দিগন্তের সূচনা করলো!

টেরাফর্মিং ইন মার্স

আমরা যখনই আমাদের পৃথিবীর বাইরে কোথাও বসতি স্থাপন করার কথা ভাবি, প্রথমেই আমাদের মাথায় আসে মঙ্গলগ্রহের কথা।এখন কথা হলো মঙ্গলগ্রহই কেন? যেহেতু বুধ, শুক্রও আমাদের প্রতিবেশী গ্রহ, তাহলে তারা নয় কেন?

প্রথমেই বলি বুধকে বসবাসের উপযোগী মনে করি না, কারণ এই গ্রহটি সূর্যের খুব খুব কাছে।
আর শুক্র গ্রহ যেন এক ভয়ংকর চুল্লী! ৯০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রা সেখানে!! গ্রিনহাউজ ইফেক্টটা শুক্রে এত বেশি যে আপনি যদি একটি পিৎজা রাখেন সেখানে, ৯ সেকেন্ডে সেটা রান্না হয়ে যাবে!

তো এবার আসি আমাদের প্রিয় বন্ধু মঙ্গলগ্রহের কথায়। কেন তাকে আমাদের প্রথম পছন্দ বাসস্থান হিসেবে? এর প্রধাণ কারণ হলো মঙ্গলগ্রহের সাথে আমাদের পৃথিবীর রয়েছে অনেক সাদৃশ্য।যেমন, মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর মত চব্বিশঘণ্টায় একবার ঘোরে।এটি তার অক্ষের দিকে পৃথিবীর মত সামান্য হেলে আছে যেটা আমাদের পৃথিবীকে sustainable (জীবনোপোযোগী) রাখার জন্য অনেকাংশে দায়ী।মঙ্গলগ্রহে আমাদের মত মেরুবরফও (polar ice cap) আছে! শুধু তাই না মঙ্গলগ্রহের ইতিহাস, আর geological evidence (ভূতাত্ত্বিক প্রমাণ)ও আমাদেরকে এটা বলে যে একসময় মঙ্গলগ্রহ প্রায় পৃথিবীর মতই বাসযোগ্য ছিল।

প্রায় ৩.৫-৪ বিলিয়ন বছর আগে মঙ্গলপৃষ্ঠ জুড়ে ছিল প্রবাহমান পানির নদী যার ছাপ এখনো তার পৃষ্ঠে রয়ে গেছে। মঙ্গলগ্রহের ছিল ঘন বায়ুমন্ডল, ছিল ক্ষতিকর রেডিয়েশন থেকে রক্ষা পাবার জন্য শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র, আরও ছিল জৈব অণু।অর্থাৎ জীবনধারণের জন্য এক উপযোগী পরিবেশ তখন মঙ্গলগ্রহের ছিল।কিন্তু এই পরিবেশ বেশি দিন স্থায়ী ছিল না।প্রায় ৩-৪ বিলিয়ন বছর আগে মঙ্গলগ্রহ তার চৌম্বকক্ষেত্র হারিয়ে ফেলে আর এর ফলে সূর্য থেকে আসা শক্তিশালী কণার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ মঙ্গলগ্রহকে ক্রমাগত আঘাত করে।আর এর ফলে মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডল ও তার পৃষ্ঠে থাকা পানি ধীরে ধীরে মহাশূন্যে হারিয়ে যায়।মঙ্গলগ্রহ পরিণত হয় এক ঠাণ্ডা মরুভূমিতে।বর্তমানে মঙ্গলগ্রহের গড় তাপমাত্রা -৮১° ফারেনহাইট, আর পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা হলো ৫৭° ফারেনহাইট যা মঙ্গলগ্রহে বাসস্থান গড়ে তোলার পথে আরেকটি বাধা।

মঙ্গলগ্রহে বসতি স্থাপনের পথে আরও কিছু সমস্যা হলো-
- সংক্ষিপ্ত আলোর পরিমাণ (পৃথিবীর প্রায় ৬০ শতাংশ)
- ভূপৃষ্ঠের তুলনায় কম মহাকর্ষ (পৃথিবীর ৩৮ শতাংশ)
- বিষাক্ত বায়ুমন্ডল
- মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠে আয়নিত সৌর ও মহাজাগতিক বিকিরণ
- কোনো খাবারের উৎস না থাকা
- নিম্ন বায়ুচাপ (পৃথিবীর মাত্র ১ শতাংশ)

তবে মঙ্গলগ্রহের ইতিহাস আর মঙ্গলগ্রহের সাথে পৃথিবীর এত মিল বারবার আমাদেরকে আশা দেখায় যে হ্যাঁ একদিন হয়ত আমরা মঙ্গলগ্রহে আমাদের পায়ের ছাপ রাখতে পারব; মঙ্গলগ্রহকে আমাদের বসবাস উপযোগী করে তুলতে পারব।আর এই আইডিয়াটাই Terraforming of Mars নামে পরিচিত।

কিন্তু এটাকে আসলেই কতটুকু বাস্তবে রূপ দেওয়া যেতে পারে? আর এক্ষেত্রে বাধাবিপত্তিগুলোই বা কি? কি কি সিদ্ধান্ত আজ পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে? সেগুলোই আজকে আমরা জানার চেষ্টা করব।

এখন পর্যন্ত আমরা যতটুকু জানি মঙ্গলগ্রহ অনেক ঠাণ্ডা একটি গ্রহ এবং এটি অনেকটা পারমাফ্রস্টের মত অর্থাৎ এটি যেন চিরস্থায়ী এক বরফ! সেই বরফ হলো পানি আর কার্বনডাই-অক্সাইড এর বরফ (dry ice)।তাই আমাদের যা করতে হবে তা হলো মঙ্গলগ্রহের তাপমাত্রা বাড়ানো যেন সেই বরফকে গলানো যায় আর বাতাসে জলীয়বাষ্প ও কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

প্রধান আরেকটি সমস্যা হলো মঙ্গলগ্রহের বায়ুমন্ডল।মঙ্গলগ্রহের বায়ুমন্ডলে বেশিরভাগই হলো কার্বনডাইঅক্সাইড, যেটি একটি গ্রিনহাউজ গ্যাস এবং তার ঘনত্ব হলো আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মাত্র এক শতাংশ।তাই যদিও মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলে পুরোটাই কার্বনডাইঅক্সাইড, কিন্তু তার পরিমাণ এত কম যে তা সূর্য থেকে পাওয়া তাপকে মঙ্গলপৃষ্ঠে ধরে রাখার জন্য যথেষ্ট না।শুধু তাই না এত কম চাপসম্পন্ন বায়ুমণ্ডল মঙ্গলপৃষ্ঠের পানিকেও তরল অবস্থায় রাখার জন্য উপযোগী না। পানি মঙ্গলগ্রহে হয়ত খুব দ্রুত বাষ্পীভূত হয়ে যায়, আর নয়ত বরফ হয়ে যায়।তাই এখন প্রশ্ন হলো মঙ্গলগ্রহের মেরুতে যে কার্বনডাইঅক্সাইড ও পানি (জলীয়বাষ্পও গ্রিনহাউজ গ্যাস) বরফ হয়ে আছে তাকে কোনোভাবে মুক্ত করা গেলে কি মঙ্গলগ্রহকে আবার প্রয়োজনমত উষ্ণ করা যাবে? এর উত্তর হলো, না।আমরা যদি কোনোভাবে মঙ্গলগ্রহের মেরুঅঞ্চলে ঠাণ্ডায় জমে থাকা বরফকে গলিয়ে বাতাসে কার্বনডাইঅক্সাইড ও জলীয়বাষ্প ছেড়ে দিই, তাও তার পরিমাণ এত কম যে তাদের পক্ষে মঙ্গলপৃষ্ঠ থেকে বিকিরিত তাপকে ধরে রাখা সম্ভব হবে না।

তাই আর একটাই রাস্তা খোলা থাকে।আর তা হলো গ্রিনহাউজ গ্যাসকে বাইরে থেকে এনে মঙ্গলগ্রহে ছেড়ে দেওয়া। এক্ষেত্রে কিছু সমাধান উপস্থাপন করা হয়।তার মধ্যে একটি হলো এমোনিয়া সমৃদ্ধ কিছু বিশাল গ্রহাণু (asteroid)-কে নাইট্রোজেনের উৎস হিসেবে মঙ্গলগ্রহের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া। অথবা রকেটের সাহায্যে CFC গ্যাস (কার্বনডাইঅক্সাইডের তুলনায় হাজারগুণ বেশি শক্তিশালী গ্রিনহাউজ গ্যাস) কে মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেওয়া। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হলো মঙ্গলগ্রহে কোনো চৌম্বকক্ষেত্র (magnetic field) না থাকা।কারণ এর অভাবে মঙ্গলগ্রহের বায়ুমন্ডল ধীরে ধীরে আবারও মহাশূন্যে হারিয়ে যাবে।যদিও এটা হতে কয়েক লক্ষ বছর লাগতে পারে।

এই সমস্যা গুলো সমাধানের জন্য ইলন মাস্ক তার কিছু আইডিয়ার কথা জানালেন।তিনি ভাবলেন কতগুলো বড় বড় প্রতিফলক(reflector) -সহ কিছু স্যাটেলাইটকে মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথে স্থাপন করা গেলে প্রতিফলকগুলো সূর্যের আলোকে আরো বেশি বেশি মঙ্গলগ্রহের দিকে ফোকাস করবে আর এভাবে মঙ্গলগ্রহ অনেক শক্তি পাবে ও উত্তপ্ত হবে। আর এটাকে ঠিকভাবে করা গেলে মোটামুটি একটা চেইন রিএকশন শুরু হবে।যার মাধ্যমে বরফগুলো গলে বায়ুমণ্ডলে কার্বনডাইঅক্সাইড ও জলীয়বাষ্প উন্মুক্ত করবে।উন্মুক্ত কার্বনডাইঅক্সাইড তাপকে বেশি বেশি ধরে রাখবে।আর এর মাধ্যমে মঙ্গলগ্রহ আরও বেশি উত্তপ্ত হবে যা আরও বরফকে গলতে সাহায্য করবে।এভাবে বাতাসে গ্রিনহাউজ গ্যাসগুলোর পরিমাণ বেড়ে যাবে।

এখন বাতাসে গ্রিনহাউজ গ্যাসগুলোর পরিমাণ বাড়ল ঠিক, কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য আমাদের তো অক্সিজেনেরও প্রয়োজন হবে।তা আসবে কোথা থেকে?

আর তখন আমাদের প্রয়োজন হবে মাইক্রোঅরগ্যানিজম (অণুজীব)দেরকে, যাদের কাজ হবে বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইডকে গ্রহণ করে বায়ুমন্ডলে অক্সিজেন মুক্ত করা।যেমনটা আমাদের পৃথিবীতে উদ্ভিদ করে থাকে।আবার আমাদের পৃথিবীতে কিছু অণুজীবও এই কাজটা করে, যেমন সায়ানোব্যাকটেরিয়া।ধারণা করা হয়ে থাকে আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের উৎস এই সায়ানোব্যাকটেরিয়াগুলোই ছিল যাদের কাজ ছিল বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইডকে গ্রহণ করে অক্সিজেনকে মুক্ত করা।

যাই হোক, এখন সমস্যা হলো মঙ্গলগ্রহকে এভাবে উষ্ণ করতে কত সময় লাগবে? হয়ত কয়েক হাজার, বা কয়েক লক্ষ বছর পর্যন্ত লেগে যেতে পারে!

এরকম অনেক সমস্যা থাকার পরেও আমরা হাল ছাড়িনা।আশা করি একদিন এসব সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে মঙ্গলগ্রহকে আমরা আমাদের বাসযোগ্য করে তুলতে পারব।আর এর মাধ্যমে হয়ত আমাদের দূষিত, ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে থাকা পৃথিবীকেও আবার বাসযোগ্য করে তোলার পথ খুঁজে পাব।

দ্য মার্শিয়ান

ছিলিয়াম
জ্যোতিরসায়ন

ChemFusion
www.chemfusion.net

মুভির নাম : দ্য মার্শিয়ান (The Martian)
পরিচালক : রিডলি স্কট
মুভির ধরণ : অ্যাডভেঞ্চার, ড্রামা, সাইন্স-ফিকশন
ভাষা : ইংরেজি
আইএমডিবি রেটিং : ৮.০/১০

লাল মাটির গ্রহ মঙ্গল, সেখানে বসতি স্থাপন করার প্রচেষ্টা মানুষের বহুদিনের।সেই ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ হল নাসার মিশন ARES 3.

সাল ২০৩৫, নাসা থেকে ৬ জন নভোচারীর একটি দলকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য পাঠানো হয় মঙ্গলে।গবেষণা চলাকালীন সময়ে হঠাৎ প্রচণ্ড সৌরঝড়ের মুখোমুখি হয়ে তারা মিশন স্থগিত করে পৃথিবীতে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।সবাই যখন মহাকাশযানের (HERMES) উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে, তখন আচমকা তীব্র আঘাতে দলের একজন সদস্য (Mark Watney) ছিটকে দূরে পড়ে যায়।দলের বাকি সদস্যরা সাথে তার যোগাযোগের চেষ্টা করেও কোন হদিস পায় না।বাকি নভোচারীরা তাকে অনেক খোঁজার পরেও না পেয়ে পৃথিবীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে এবং Mark watney কে মৃত বলে ঘোষনা দেয়।পরের দিন (Mission day- SOL 19) Mark এর জ্ঞান ফিরলে সে বুঝতে পারে পুরো গ্রহে সে একা।মিশনের জন্য বানানো অস্থায়ী বাসস্থানে (HAB) সে অবস্থান নেয় যা মাত্র ৩১ দিনের জন্য বানানো।সে বুঝতে পারে তার বাঁচার জন্যে পর্যাপ্ত পানি, অক্সিজেন, বিদ্যুৎ, খাবার নেই।

মঙ্গলের পরবর্তী মানব অভিযান ARES 4, যেটি চার বছর পর আসবে।তার কাছে যতটুক খাবার আছে তা দিয়ে মোটামুটি ৩০০ দিন চলবে।কিন্তু তাকে আরো অনেক দিনের খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে।একদিন সে সংরক্ষিত খাবারের মাঝে কিছু আলু পায়।যেহেতু Watney উদ্ভিদবিজ্ঞানী, তার মাথায় কাজ করে কিভাবে আলু চাষ করা যায় যাতে আরো ৩ বছর বেঁচে থাকা যাবে।সে আলু চাষের জন্য একটা কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে।তাদের টিমমেট এর দেহ থেকে নিঃসৃত পরিপাকৃত জৈব পদার্থের ভেতরে আলু কেটে তা মঙ্গলের মাটিতে রোপন করে কিন্তু চাষের জন্য যে প্রচুর পানি দরকার।সে জন্য তার চাই অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন, তা পুড়িয়ে সে পানি বানাবে॥MDV এর অব্যবহৃত হাইড্রাজিনকে ইরিডিয়াম প্রভাবকের উপর দিয়ে চালনা করে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন পৃথক করে সে।তারপর সেই হাইড্রোজেন কে ছোট এরিয়ায় প্রবেশ করায় এবং পোড়ায়।কিন্তু তা একটি বিস্ফোরণ ঘটায়।Mark পরে বুঝতে পারে ঐ বিস্ফোরণ তার নিঃশ্বাসের সাথে থাকা বাড়তি অক্সিজেনের জন্যে হয়েছে।পরবর্তীতে সে পানি তৈরিতে সক্ষম হয়।

ততদিনে নাসার স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন টিম বুঝতে পারে Watney বেঁচে আছে।অন্যদিকে watney ভাবে তাকে যত দ্রুত সম্ভব নাসার সাথে যোগাযোগ করে তার জীবিত থাকার কথা জানাতে হবে ।সে ঠিক করে Ares 4 এর পরবর্তী ল্যান্ডিং এর জায়গায় যাবে, যা প্রায় ৩২০০ কিমি দূরে।সেজন্য তাকে Rover নামের গাড়ির সাহায্য নিতে হবে যেটি আনুমানিক ৫০ দিন এর মধ্যে Ares 4 অবতারণের জায়গায় পৌঁছবে।যাত্রা শুরু করার পর সে বুঝে রাতে মঙ্গলের তাপমাত্রা অনেক কমে যায়, কিন্তু যদি Rover এর হিটার ব্যবহার করে তাহলে ব্যাটারি দ্রুত খরচ হয়ে যাবে যার, নতুবা সে তীব্র শীতে মারা যাবে।এই সমস্যা সমাধানে সে তার Rover এর সাথে ক্ষয়প্রাপ্ত রেডিও এক্টিভ আইসোটোপ প্লুটোনিয়াম (যেটা মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছিল) বসায় যা ROVER এর তাপমাত্রা ও মার্কের প্রাণবায়ু ধরে রাখে।

Watney সৌভাগ্যবশত ১৯৯৭ সালে পাঠানো pathfinder নামের একটি স্পেসক্রাফটের সাহায্যে পৃথিবীতে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে।সেটিটে ক্যামেরার আছে আর শুধু ঘুরতে পারে।Watney হেক্সাডেসিমেলের মাধ্যমে যোগাযোগ চালায়।সে ১৬ টা অক্ষর ৩৬০ ডিগ্রীতে ভাগ করে এবং সেইভাবে কথা আদানপ্রদান করে।তারপর সে PATHFINDER হ্যাক করে টেক্সের মাধ্যমে নাসায় আলাপ করে।ফ্লাইট ডিরেক্টর ARES 3 এর সহযাত্রীদের অবগত করেন Mark এখনো বেঁচে থাকার কথা এবং তারা Mark এর সাথে যোগাযোগ করতে পারে।

অন্যদিকে আলুর চারাগুলো বড় হতে থাকে, প্রায় ৪০০ চারা জন্মায়, Mark সেগুলো তুলে বড় আলুগুলো নিজের খাবারের জন্যে রাখে, ছোটগুলা দিয়ে আবার চাষের ব্যবস্থা করে।একদিন ভুলবশত HAB এ বিস্ফোরণ হয়, সবগুলা গাছ নষ্ট হয়ে যায়।ফলে Watney খাদ্য সংকটে পড়ে।নাসা থেকে তা পাঠানোর ব্যবস্থা করলেও তা মঙ্গলে পৌঁছতে পৌঁছতে Mark খাদ্যাভাবে মারা যাবে নিশ্চিত।

একজন অ্যাস্ট্রোডাইনামিস্ট Watney কে উদ্ধারের একটা উপায় বের করে।Hermes নামক যে মহাকাশযানে চড়ে নভোচারীরা আসছে সেটি পৃথিবীতে অবতরণ না করে তার সাথে যদি প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও সাহায্য দিয়ে দেওয়া হয়, তারপর সেটিকে পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরে 'slingshot' এর মাধ্যমে পুনরায় মঙ্গলের দিকে পাঠানো যায় তবে তারা Ares 4 এরও দুই বছর আগে মঙ্গলে পৌঁছতে পারবে।কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় একটা সমস্যা রয়েছে।মহাকাশযানটি মঙ্গলের অরবিটে প্রবেশ করতে পারবে না।প্রবেশ করলে এটির পৃথিবীতে ফেরত আসার মত জ্বালানী থাকবে না। Mark কে কোনভাবে মঙ্গলের অরবিটের বাইরে আসতে হবে।তবে নাসা এই সম্ভাবনা বাতিল করে দেয়।কারণ, একজন নভোচারীর জন্য বাকি ৫ জন নভোযাত্রীর জীবন ঝুঁকিতে ফেলা সম্ভব নয়।

তাহলে Mark কে কিভাবে উদ্ধার করা হবে? সে কি ততদিন বেঁচে থাকবে? পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবে? নাকি একাকী একটি গ্রহে শীতল মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে ? অ্যান্ডি উইয়ার এর বই "দ্য মার্শিয়ান" এর গল্পে মুভিটি নির্মিত। পুরো মুভিতে মার্কের সেন্স অব হিউমার, জীবন যুদ্ধে হার না মানা, ইতিবাচক মনোভাব দর্শকদের আকর্ষিত করে। বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাগুলোর কারণে সাই-ফাইপ্রেমীরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মুভিটি দেখতে বাধ্য।মার্কের শ্বাসরুদ্ধকর অভিজ্ঞতা যেন দর্শকদের মাঝেও রোমাঞ্চকর অনুভূতির সৃষ্টি করে।ভিন্নমাত্রার কিছু উপভোগ করতে দেখে ফেলতে পারেন এই চমৎকার মুভিটি।

ChemFusion
www.chemfusion.net

লাইফ ইন ভেনাস

ChemFusion
www.chemfusion.net

ফসফিন- ফসফরাস ও হাইড্রোজেনের মেলবন্ধনে সৃষ্ট এই গ্যাসীয় যৌগটির নাম আমরা অনেকেই শুনেছি।বর্ণহীন, ঝাঁঝালো গন্ধ বিশিষ্ট, একই সাথে বিষাক্ত ও দাহ্য ধর্ম সম্পন্ন- শুনতে আর চার-পাঁচটা গ্যাসের মত সাধারণ লাগলেও নাইট্রোজেন গ্রুপের অন্য সব মৌলের হাইড্রাইডের থেকে আলাদা এটি।অদ্ভুত বিক্রিয়া, ভৌত কিংবা রাসায়নিক ধর্মের জন্য নয়- ফসফিনকে সাধারণের মধ্যে অসাধারণ গণ্য করা হয় 'বায়োমার্কার' তথা Indicator of life অর্থাৎ প্রাণের অস্তিত্বের চিহ্নবহনকারী হিসেবে।

বলছিলাম প্রতিবেশী গ্রহ ভেনাসের কথা।নাতিশীতোষ্ণ ও চরম মাত্রায় এসিডিক যেখানকার বায়ুমণ্ডল, ফসফরাসের মত অধাতু সেখানে অক্সিডাইজড যৌগরূপে (ফসফরিক এসিড ও ফসফেটস) থাকাটাই হয়ত স্বাভাবিক ছিল।কিন্তু সম্প্রতি ভেনাসের বায়ুমণ্ডলে ফসফিন গ্যাসের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে বলে জানিয়েছেন হাওয়াই এবং চিলির একদল গবেষক।

ALMA and JCMT রেডিও টেলিস্কোপকে ব্যবহার করে মিলিমিটার ওয়েভব্যান্ডে ফসফিনের ১-০ রোটেশনাল ট্রানজিশনকে শনাক্তের চেষ্টা চালান তাঁরা।গবেষণায় SINGLE LINE MILIMETRE WAVEBAND SPECTRAL DETECTION এ বায়ুমন্ডলীয় ফসফিনের যে পরিমাণ পাওয়া গেছে তা প্রায় পার্টস পার বিলিয়ন এর মত।ভেনাসে প্রাণের অস্তিত্বের এই সম্ভাবনাকে নাকি নাকচ করে দিয়েছিলেন অনেকেই।কেননা, ৫০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মত পৃষ্ঠ তাপমাত্রা আর পৃথিবীর তুলনায় ১০০ গুণেরও বেশি বায়ুমণ্ডলীয় চাপ আর যাই হোক, প্রাণের অস্তিত্ব পাওয়ার জন্য চরম মাত্রায় প্রতিকূল।তবে এখন আর এই সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। কেননা- বায়ুমণ্ডলীয় ফসফিনের এ উপস্থিতি পৃথিবীর Anerobic Ecological System থেকে প্রাপ্ত ফসফিনের পরিমাণের সাথে অনেকটাই সঙ্গতিপূর্ণ।

প্রস্তরময় গ্রহটিতে ট্রেস এলিমেন্ট হিসেবে সুপরিচিত গ্যাসটির তুলনামূলক উল্লেখযোগ্য পরিমাণের উপস্থিতি আসলে অন্য কিসের ইঙ্গিত বহন করছে কিংবা এর নেপথ্যের কারণ কী -এসব প্রশ্ন আপনি আমি ছাড়াও অনেক এস্ট্রোলজারকেই ভাবিয়ে তুলেছে!

Extrasolar Planet গুলিতে ফসফিন গ্যাসের উপস্থিতি নতুন কিছু নয়।
নক্ষত্রীয় বায়ুমণ্ডল, বিশেষত কার্বন স্টার কিংবা Gas Giant নামে পরিচিত জুপিটার, স্যাটার্নের মত গ্রহপরিবেশে ফসফিনের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়।প্রথম দিকে, জুপিটার এবং স্যাটার্নের মত গ্রহগুলিতে তাপমাত্রার আধিক্যকে (৮০০ কেলভিন বা তার উপরে) ফসফিন তৈরির পক্ষে সম্ভাব্য কারণরূপে বিজ্ঞানীরা চিহ্নিত করেছিলেন।তাঁদের এরূপ ধারণার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তিও ছিল।কারণ সেই অবধি যে গ্রহগুলোতে ফসফিনের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল পৃষ্ঠ সংলগ্ন তাপমাত্রা ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ফসফিন তৈরির জন্য অনুকূল ছিল।

ধারণা করা হয়, এসব Extrasolar Planet গুলিতে গভীর বায়ুমণ্ডলীয় স্তরে উচ্চ তাপমাত্রা ও চাপে ফসফিন তৈরি হয় এবং বজ্রপাতের মাধ্যমে সৃষ্ট পরিচলন বিদ্যুৎপ্রবাহ এই গ্যাসকে আরও উপরের স্তরে উঠিয়ে দেয়।তৈরি হওয়া এই শূন্যস্থান আবারো পূরণ হয় ফসফিন গ্যাস লেয়ার দ্বারা।যার ফলে সৃষ্ট একটি জনপ্রিয় ধারণা হলো, জুপিটারের জায়ান্ট রেডস্পট মূলত ফসফিনের ফটোলাইসিসের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন ফসফরাস স্পিসিসের উপস্থিতি, যা ক্লাউড হিসেবে উপরে উঠে যায় এবং Red Tinge (লালচে বর্ণ) রূপে দৃশ্যমান হয়।যদিও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় আইস জায়ান্ট ইউরেনাস ও নেপচুনের ক্ষেত্রে।পর্যাপ্ত তাপমাত্রাসম্পন্ন উষ্ণ মণ্ডলের উপস্থিতি কিংবা পরিচলন বিদ্যুতের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও সেখানে ফসফিনের অস্তিত্ব এখন পর্যন্ত চিহ্নিত হয় নি।

মনুষ্যসৃষ্ট কারণ ছাড়াও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে উচ্চতাভেদে বিভিন্ন মাত্রায় বিরাজ করা এই গ্যাসের উল্লেখযোগ্য একটি পরিমাণ আসে অবাত অণুজীব বা anerobic microbes থেকে।জৈবিক প্রক্রিয়ায় ফসফিনের উৎপাদন পরিবেশের অবাত অণুজীবের ক্রিয়াকলাপের সাথে এতোটাই নিবিড়ভাবে জড়িত যে তা জীবনরক্ষাকারী অক্সিজেনের সাথে বিষাক্ত ফসফিনের সাংঘর্ষিক ধর্মকেই সুস্পষ্টভাবে জানান দেয়।ইতোমধ্যে কয়েকটি পরিবেশ ও ভূতাত্ত্বিক নিরীক্ষা থেকে বিভিন্ন এনারোবিক সিস্টেম যেমন- প্রকৃতিতে উন্মুক্ত শিল্প কারখানা কিংবা পয়নিষ্কাশন বর্জ্যের স্লাজ (sludge), জলাভূমিতে anoxic microbial activity ইত্যাদি থেকে জৈবিক ফসফিন পরিবেশে উন্মুক্ত হবার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

নাইট্রোজেন ফিক্সেশনের মতোই ফসফরাসের জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ এসব জৈবিক চক্রসমূহকে আপাতদৃষ্টিতে ফসফেট-নির্ভর মনে হলেও অন্যান্য ফসফরাস যৌগের ন্যায় ফসফিনও এসব চক্রে প্রভাবনীয় ভূমিকা রাখে বলে মনে করা হয়।সাদা ফসফরাস কিংবা ক্যালসিয়াম ফসফাইডের সাথে পানির সংযোগে ল্যাবরেটরিতে ফসফিন গ্যাসকে যতটা নির্ভেজালভাবে সংশ্লেষণ করা হয়, তার বিপরীতে প্রকৃতিতে ফসফিনের বিশাল ও নিয়ন্ত্রিতযজ্ঞ সম্ভবত আমাদের ধারণার বাইরে।

এনারোবিক মাইক্রোবস এর অস্তিত্বের সাথে ফসফিনের এরূপ সম্পর্ক বৈজ্ঞানিক মহলে সমাদৃত হলেও, প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলোর বিপরীতে জটিল মাইক্রোবিয়াল সিস্টেমে গ্যাসটির ক্রমাগত উৎপাদন ঠিক কোন পাথওয়ে অনুসরণ করে হয় সেটি কিন্তু আজও বিতর্কিত।ফসফিনের উৎপাদন নিয়ে এনারোবিক ব্যাকটেরিয়ার দুই ধরনের ভূমিকার কথা ভাবা হচ্ছে-

১) এরা পরিবেশে বিরাজমান ফসফরাসকে ব্যবহার করেই সম্ভবত ফসফিন সংশ্লেষণ করে এবং তা পরিবেশে ছেড়ে দেয়।

২) জৈব বস্তুর Anoxic fermentation (মুক্ত অক্সিজেনের অনুপস্থিতে ফার্মেন্টেশন) এ এরা যেসব এসিডিক প্রোডাক্ট তৈরি করে সেসবের সাথে অজৈব ধাতব ফসফাইডের বিক্রিয়ায় ফসফিন শেষ পর্যন্ত পরিবেশে মুক্ত হয়।

ChemFusion
www.chemfusion.net

বায়োসিগনেচার গ্যাস হিসেবে ইতোমধ্যেই বিজ্ঞানীরা শনাক্ত করেছেন অক্সিজেন, মিথেন, ডাই মিথাইল সালফাইড, নাইট্রাস অক্সাইড।এসব গ্যাসের প্রত্যেকটিরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এক্সোপ্ল্যানেটেসমূহের তাপমাত্রা ও পৃষ্ঠচাপে এরা উদ্বায়ী স্থায়ী পদার্থরূপে বিরাজ করে এবং শনাক্ত উপযোগী নির্দিষ্ট মাত্রায় সেখানকার বায়ুমণ্ডলে বিরাজ করে এবং নির্দিষ্ট তরংগদৈর্ঘ্যে নির্দিষ্ট spectral feature বিশিষ্ট হয়।বাস্তুতন্ত্রে জীবের জীবন চক্রে ক্রমাগত সংঘটিত জটিল মেটাবলিক প্রক্রিয়ার বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে এরা যে পরিবেশে নির্গত হয় সেখানে এবায়োটিক কোনো পাথওয়েতে এসব গ্যাস সংশ্লেষণের সম্ভাব্যতাকে অতীব ক্ষীণ বলে বিবেচনা করা হয়।এই শর্তে বাস্তুতন্ত্রে নির্দিষ্ট জীবের অস্তিত্বের চিহ্ন বহন করে গ্যাসগুলো, তবে এটা প্রাথমিকভাবে নিছকই একটা অনুমান হতে পারে কেবল, জোরালো কোনো তত্ত্ব নয়।

আদর্শ বায়োসিগনেচার গ্যাসের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যগুলো ফসফিনের ক্ষেত্রে কার্যকর হলেও এর উপস্থিতির তাৎপর্যকে গণ্য করতে চাননি অনেকেই।ধারণা করা হয়েছিল, ভেনাসের অম্লীয় বায়ুমণ্ডল বা সারফেসই হয়তবা ফসফিনের উৎস যেখানে অক্সিডাইজড ফর্মে (ফসফেটরূপে) ফসফরাস পাওয়া যেতে পারে।কিন্তু ফলাফল বিশ্লেষণে শেষ পর্যন্ত চিলির এ গবেষকদল ভেনাসিয়ান সারফেসে ফসফরাসের সুনির্দিষ্ট কোনো উৎসের উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন নি। JCMT রেডিও টেলিস্কোপ থেকে প্রাপ্ত উপাত্তকে ব্যবহার করে থার্মোডায়নামিক ইকুইলিব্রিয়ামের সম্পৃক্ততাকেও তাঁরা যাচাই করে দেখেছেন।২৭০-১৫০০ কেলভিন বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রায় ০.২৫-১০০০০ বার পৃষ্ঠচাপে প্রভাবক-বিক্রিয়কের ঘনমাত্রাকে চলক বিবেচনা করে ফসফিন সংশ্লেষণের প্রায় ৭৫ টি সম্ভাব্য পাথওয়েকে চিহ্নিত করা হয় কিন্তু এর কোনোটিতেই ফসফিন তৈরির বিক্রিয়া স্বতস্ফূর্ত ছিল না।এই পর্যবেক্ষণ থেকে তাত্ত্বিক কোনো ব্যাখ্যায় না পৌঁছাতে পারলেও দুইটি অনুসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় -

প্রথমত ভূস্তরীয় শিলা বা উল্কাপাতে মুক্ত ফসফাইডের হাইড্রোলাইসিসে এ ফসফিন তৈরি হওয়া সম্ভব নয় আর দ্বিতীয়ত ভেনাসের তাপমাত্রা ফসফরাস এসিড থেকে ফসফিন তৈরির জন্য সহায়ক হলেও এর ফরমেশনে যে বিজারণ পরিবেশ দরকার হয় তা ভেনাসে নেই।

অন্যান্য অক্সিডাইজড স্পিসিস থেকে ফসফিন তৈরির বিক্রিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই H ফ্রি র‍্যাডিকেল প্রভাবিত।কিন্তু হাইড্রোজেন উৎসের অপর্যাপ্ততা, বিক্রিয়ার অতি ধীর গতি ইত্যাদি সম্ভাব্য কারণসমূহের জন্য এই অনুমানও পরে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা পায় নি।

Steady State Chemistry, ফটোকেমিক্যাল পাথওয়ের বিশ্লেষণে ভেনাসিয়ান পরিবেশ, ক্লাউড, সারফেসে ফসফিনের কোনো সম্ভাব্য থার্মোডায়নামিকালি ফেভারেবল abiotic (অজৈবিক) সংশ্লেষণ রুট এখন অবধি পাওয়া যায় নি।তবে ফসফিনের অস্তিত্বের পেছনে এসব রুটের ভূমিকা যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ নয় সেটা অনেকাংশেই নিশ্চিত। তাই ফসফিনকে ঘিরে প্রাণের যে আভাস পাওয়া যাচ্ছে তা একেবারে উপেক্ষণীয় নয়।বজ্রনাদ, অগ্ন্যুৎপাত, উল্কাপাতের মত দৈব ঘটনার সম্পৃক্ততাকে এস্ট্রোলজারদের একতরফাভাবে সমর্থন না করার পেছনে যুক্তিটা ঠিক এরকম যে- ভেনাসের অম্লীয় পরিবেশে ফসফিনের যে হারে ডিগ্রেডেশন ঘটার কথা, তার কাউন্টার ব্যালেন্স হিসেবে সমতুল্য পরিমাণ ফসফিন প্রাকৃতিক উপায়ে ফিরে আসে না ।ফলে পৃথিবীর সমপরিমাণ পরিবেশীয় ফসফিন মুক্ত হতে ভেনাসে পৃথিবীর তুলনায় ২০০ গুণেরও অধিক অগ্ন্যুতপাত ঘটা প্রয়োজন।

বায়ুমণ্ডলেবায়ুমণ্ডলে parts per billion পরিমাণ ফসফিনের অস্তিত্বের পেছনে যৌগটির দীর্ঘ জীবনকালও অন্যতম একটি ফ্যাক্টর।বায়ুমণ্ডলীয় স্তরভেদে উচ্চ ঘনমাত্রায় সক্রিয় ক্লোরিন ফ্রি র‍্যাডিকেলের উপস্থিতি, UV radiation কিংবা thermal decomposition ফসফিনের ডিগ্রেডেশন ঘটানোর জন্য যথেষ্ট ।কিন্তু অধিক surface flux, মেসোস্ফিয়ার পর্যন্ত প্রায় সর্বোচ্চ ১০০০ বছরের মত সামগ্রিক জীবনকাল তাদের এরূপ একুমুলেশনের নেপথ্যে একটা কারণ হতে পারে।পরিমাণগত বিশ্লেষণে মেসোস্ফিয়ার বা তার উচ্চস্তরীয় বায়ুমণ্ডলে ফসফিনের যে প্রোডাকশন রেট (~106-107 moleculescm-2s-1) দেখতে পাওয়া যায় তা anerobic ecological system থেকে কিছুটা কম (~107-108 moleculecm-2s-1)।ফসফিনের এরূপ প্রাপ্যতা মেরু অক্ষাংশের তুলনায় মধ্য অক্ষাংশে বেশি; এমনকি বিষুবীয় অঞ্চলে এই প্রবণতা একেবারে কম না হলেও মধ্য অক্ষাংশ অপেক্ষা কিছুটা কম।

তবে এ পর্যন্ত হওয়া পর্যবেক্ষণসমূহ থেকে, বিষয়টিকে কেবল Astronomical Explanation এর সীমাবদ্ধতা রূপেই দেখছেন কেউ কেউ।প্রাণের অস্তিত্বের এই অনুমানকে ধারণাগত ত্রুটিরূপে বিবেচনা করে এক্সপেরিমেন্টাল মডেলসমূহের সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে আরও বিস্তারিত গবেষণার প্রয়োজনবোধ করছেন অনেকেই। পৃথিবীতে এনারোবিক স্পিসিস যেভাবে ফসফিন সংশ্লেষণ করে, ভেনাসের প্রতিকূল পরিবেশেও এসব স্পিসিস একইভাবে তা করতে পারে কি না কিংবা অন্য কোনো স্পিসিসের পক্ষে তা করা সম্ভব কি না- এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু এখনো আড়ালেই রয়ে গেছে!

কে জানে ফসফিন অণুকে ঘিরেই হয়ত উন্মোচিত হতে পারে নতুন কোনো রহস্য, আমরা পেতে পারি প্রাণের নতুন সন্ধান!!

ChemFusion
www.chemfusion.net

মিশন দ্য ভিঞ্চি

মানুষ এই পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী।মানুষের প্রচন্ড আগ্রহ আছে অজানাকে জানার।আর এই অজানাকে জানতেই মানুষ এই পৃথিবীর বাইরে অন্য কোনো গ্রহে বিভিন্ন মিশন পাঠায় এবং পাঠাবে।

তেমনি একটি মিশন হলো DAVINCI (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry and Imaging)

DAVINCI হচ্ছে একটি প্রস্তাবিত মিশন যা শুক্রের বায়ুমন্ডলের রহস্য উদঘাটন করবে।নাসার ডিসকাভারি প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত নাসা গডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টারের তত্ত্বাবধানে ২০২৬ সালে এটি লঞ্চ করা হবে।এর প্রধান ইনভেস্টিগেটর হচ্ছে জেমস্ বি. গার্ভিন।

DAVINCI শুক্রে অবতরনের সময় এর বায়ুমন্ডলে ভ্রমন করে বায়ুর নমুনা সংগ্রহ করবে এবং সংগৃহীত নমুনার তথ্য প্রদান করবে।এই তথ্যগুলো শুক্রের বায়ুমন্ডলের উৎপত্তি, পরিব্যাপ্তি, গঠনতত্ত্ব, আবহাওয়া এবং পৃথিবী ও মঙ্গলের বায়ুমন্ডলের সাথে পার্থক্য বুঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।পাশাপাশি এটি শুক্রে পানির অস্তিত্ব ও অপরীক্ষিত নিম্ন বায়ুমন্ডলের রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলোর রহস্য উদঘাটন করবে।

DAVINCI এর আগে শুক্রে পাঠানো মিশনগুলো অনেক দূর থেকে তথ্য সংগ্রহ করলেও এটি সরাসরি শুক্রের বায়ুমন্ডল থেকে তথ্য পাঠাবে।যে তথ্যগুলো National Research Council Planetary Science Decadal Survey's Venus In Situ Explore (VICE) এর উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করবে।

DAVINCI এমনভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে যে এটি শুক্রে উপস্থিত নোবেল গ্যাস, ট্রেস গ্যাস এবং তাদের আইসোটোপ, তাপমাত্রা, চাপ ও ছবি প্রেরন করতে পারে।

DAVINCI এর ভেনাস অ্যানালাইটিক্যাল ল্যাবরেটরিটি(VAL) মঙ্গলে প্রেরিত রোভার কিউরিওসিটির সেম্পল অ্যানালাইসিস যন্ত্রের উপর ভিত্তি করে তৈরি।

ChemFusion
www.chemfusion.net

DAVINCI চারটি যন্ত্রের সমন্বয়ে গঠিতঃ

Venus Mass spectometer: কিউরিওসিটি Quadrupole mass spectrometer (QMS) এর মতই VMS শুক্রের নোবেল ও ট্রেস গ্যাস এবং নতুন গ্যাস সম্পর্কে ব্যাপক তথ্য প্রদান করবে।

V**enus Tunable Laser spectrometer** (**VTLS**) : কিউরিওসিটির TLS এর মতই VTLS শুক্রের ট্রেস গ্যাস এবং তাদের আইসোটোপের অনুপাত, নিম্ন ও উচ্চ স্তরের বায়ুমন্ডলের রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য প্রদান করবে।

V**enus Atmospheric Structure Investigation** (**VASI**) : AVSI শুক্রের বায়ুমন্ডলে প্রবেশের সময় এবং তার পৃষ্ঠে অবতরণের সময় এর বায়ুমন্ডলের গঠন এবং পরিবর্তনের তথ্য প্রদান করবে।এছাড়াও শুক্রের মাটিতে অবতরণের জন্য নিজেকে পুনর্গঠন করতে সক্ষম হবে।

Venus Descent Imager (**VenDI**) : কিউরিওসিটির ক্যামেরার মতই VenDIও শুক্রের পৃষ্ঠের উচ্চ কন্ট্রাস্ট এর ছবি প্রদান করতে সক্ষম হবে।

পৃথিবী

এই সৌরজগতে পৃথিবীই একমাত্র গ্রহ যেখানে প্রাণের স্পন্দন আছে।এলিয়েন, মঙ্গলে পানি ইত্যাদি নানা শোরগোলের মধ্যে এখন পর্যন্ত জীবনের একমাত্র আধার হিসেবে মুকুট ধরে রেখেছে এই ধরিত্রী।

জ্যোতির্রসায়নের পাশাপাশি পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত রসায়নের লক্ষ কোটি ক্রিয়া-বিক্রিয়া চলমান ।পৃথিবীর পৃষ্ঠের প্রায় **29**% ভূমি যা মহাদেশ এবং দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে গঠিত ।বাকী ৭১% জলে নিমজ্জিত থাকে, এর বেশিরভাগই সমুদ্র তবে হ্রদ, নদী এবং অন্যান্য মিঠা পানির উৎস ও রয়েছে।তবে পৃথিবীর মোট জলের মাত্র ২.৫% ই সুপেয় অর্থাৎ কবির ভাষায় "**water water everywhere**, **nor any drop to drink**." তবুও এই জলই করেছে ধরিত্রীর বুকে প্রাণের সঞ্চার ; সবুজ বনভূমি হতে লোনাপানির প্রবাল,অ্যামিবা থেকে নীলতিমি।

পৃথিবীর বেশিরভাগ মেরু অঞ্চল বরফে আচ্ছাদিত।পৃথিবীর বাইরের স্তরটি কয়েক মিলিয়ন বছর ধরে পুরো পৃষ্ঠ জুড়ে মাইগ্রেশন করে এমন কয়েকটি অনমনীয় টেকটোনিক প্লেটে বিভক্ত।একটি শক্ত লৌহ নির্মিত অভ্যন্তরীণ কোর, তরল বাহ্যিক কোর যা পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি করে এবং প্লেট টেকটনিক্স চালিত করে এমন একটি উত্তেজক আবরণ দিয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তর সক্রিয় থাকে।

পৃথিবীর চাঁদ

"আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা, খোকার চোখে ঘুম নেই,ঘুম দিয়ে যা" ছোটবেলায় জানালা দিয়ে চাঁদ দেখার ফাঁকে মায়ের মুখে এই ছন্দ শোনা কেবল সৌভাগ্যবানদেরই জোটে।

পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে রাতের আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল এবং বৃহত্তম যে বস্তু দেখতে পাই তা পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদ।এটি পৃথিবীকে আরও জীবনযাত্রার উপযোগী হিসেবে পরিণত করেছে; পৃথিবীর আবহাওয়া তুলনামূলক স্থিতিশীল রাখার মাধ্যমে।একইসাথে এটি জোয়ার ভাটা ও নিয়ন্ত্রণ করে।এমনকি আহ্নিক গতির সাথেও এটি সম্পর্কযুক্ত।চাঁদের একটি মূল অংশ, আবরণ এবং ভূত্বক রয়েছে।

www.chemfusion.net

চাঁদের মূল অংশ পৃথিবীর কোরের তুলনায় আনুপাতিকভাবে ছোট।শক্ত, লোহা সমৃদ্ধ অভ্যন্তরীণ কোরটি ব্যাসার্ধে ১৪৯ মাইল।এটি চারপাশে লম্বা তরল লোহার শেল দিয়ে ৫৬ মাইল পুরু।৯৩ মেইল দৈর্ঘ্যের একটি আংশিক গলিত স্তর লোহার কোর কে ঘিরে রেখেছে।আচ্ছাদনটি আংশিক গলিত স্তরের শীর্ষ থেকে চাঁদের পৃষ্ঠের নিচে পর্যন্ত প্রসারিত।এটি সম্ভবত অলিভাইন এবং পাইরোক্সিনের মতো খনিজ দিয়ে তৈরি, যা ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, সিলিকন এবং অক্সিজেন পরমাণু দিয়ে গঠিত।চাঁদের পৃষ্ঠ অক্সিজেন, সিলিকন, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, ক্যালসিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়াম এবং স্বল্প পরিমাণে টাইটানিয়াম, ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, পটাশিয়াম এবং হাইড্রোজেন দিয়ে তৈরি।স্নায়ুযুদ্ধের ডামাডোলে চাঁদের বুকে প্রথম পা রাখেন নীল আর্মস্ট্রং।দূরের চাঁদ আজ কেবল কল্পনা নয়,মানব পদতলে নত মানুষ আজ কেবল চাঁদে সন্তুষ্ট নয়,মঙ্গল হবে এবার নত।

বৃহস্পতি : আকাশ দেবতা

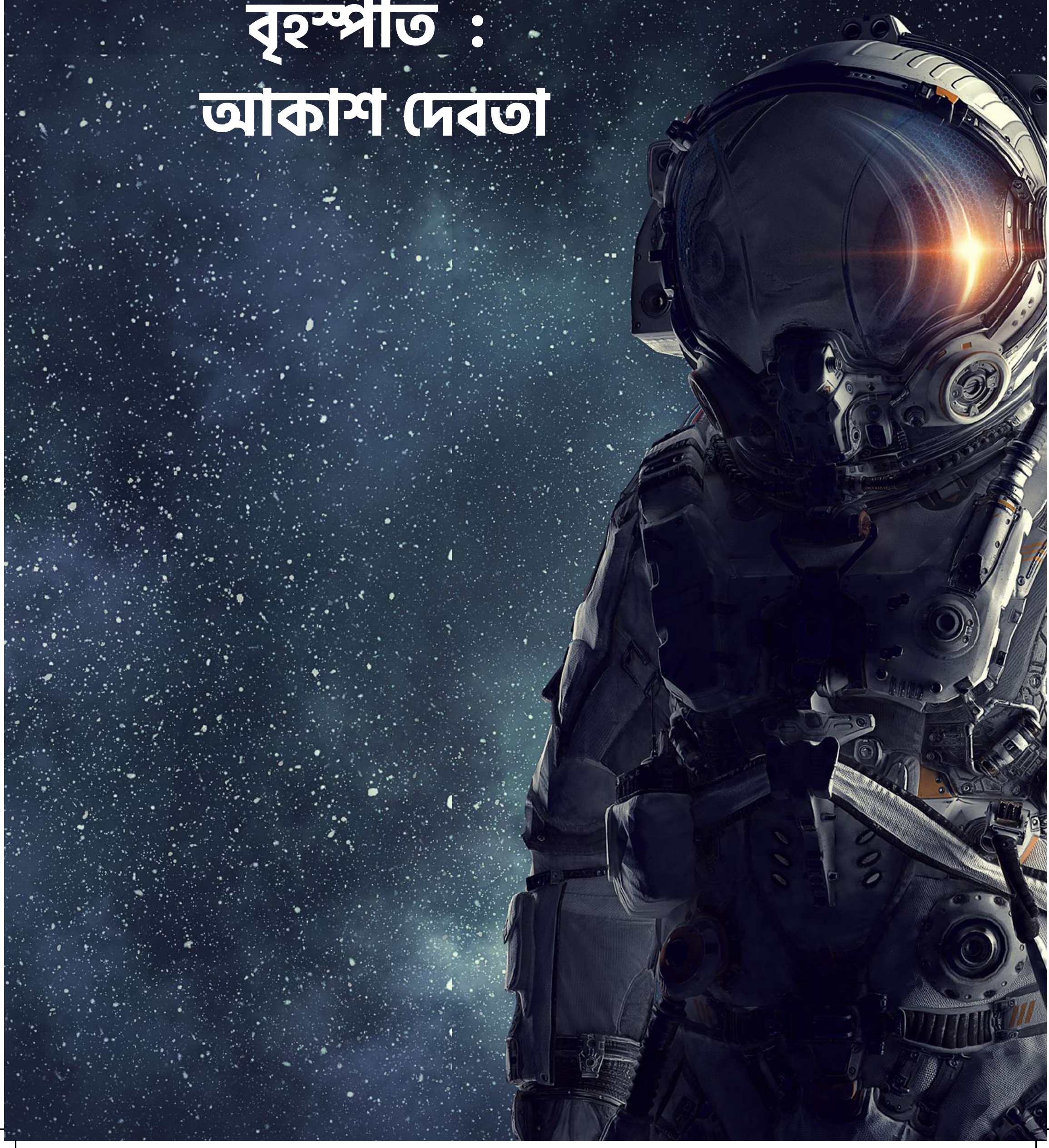

ChemFusion
www.chemfusion.net

জুপিটার, বা জোভ, রোমান মিথোলজি অনুযায়ী যিনি আকাশ এবং বজ্রপাতের দেবতা, তাঁর নামানুসারে সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহটির নাম রাখা হয়েছে জুপিটার, বাংলায় যাকে আমরা চিনি বৃহস্পতি বলে। সৌরজগতের বৃহত্তম এবং অবস্থানের দিক থেকে পঞ্চম এই গ্রহটি হলো পৃথিবীর আকাশে তৃতীয় উজ্জ্বলতম বস্তু। বৃহস্পতির আপাত মান -২.৯৪- শুক্র যেহেতু সন্ধ্যা বা ভোরে দৃশ্যমান, চাঁদহীন কোনো রাতে বৃহস্পতিই আকাশে সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান।

বৃহস্পতি হলো এক গ্যাস-দানব, যার ব্যাস প্রায় ৭০,০০০ কি.মি., যা পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় ১১ গুণ।হাইড্রোজেন আর হিলিয়ামের তৈরি এই গ্যাসীয় বলের মধ্যে ১৩০০ পৃথিবী অনায়াসে এঁটে যেতে পারে।বৃহস্পতির চাইতেও বড় বড় গ্রহ অবশ্য আছে, তবে ওরা আমাদের সৌরজগতের বাসিন্দা নয়।এসব বাইরের গ্রহদের বলা হয় এক্সোপ্ল্যানেট বা বহির্গ্রহ।

জুপিটারের ছোটো পাথর এবং বরফের তৈরি কেন্দ্রস্থল ঘিরে রয়েছে তরল ধাতব হাইড্রোজেনের গভীর স্তর।গ্রহটির ব্যাসের শতকরা আশি ভাগ জুড়ে থাকা এই স্তরের হাইড্রোজেন থাকে আণবিক অবস্থায় এবং তা পর্যায়সারণীর প্রথম গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত ক্ষারধাতুগুলোর বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।ধারণা করা হয়- গ্রহের শক্তিশালী চৌম্বকমণ্ডলের উদ্ভব হয়েছে এই ধাতব হাইড্রোজেনের কারণে।উল্লেখ্য, পৃথিবীর কোনো গবেষণাগারে এখনো ধাতব হাইড্রোজেন তৈরি করা সম্ভব হয় নি।

জুপিটারের আজব কেন্দ্রস্থল থেকে ঘুরে আসার পর একটু চাপ-তাপমাত্রা নিয়ে কথা বলা যাক।এর পৃষ্ঠতলের চাপ এবং তাপমাত্রা হাইড্রোজেনের সংকটবিন্দুর অনেক ওপরে।তাই ধারণা করা হয়, গ্রহটির অভ্যন্তরীণ গঠন সুষমভাবে তরল কেন্দ্রস্থল থেকে গ্যাসীয় বায়ুমন্ডলে পরিবর্তিত হয়।

কঠিন সমতল না থাকায়, বৃহস্পতির স্থলভাগকে সংজ্ঞায়িত করা হয় 1atm (১ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ) স্তরে।যার ফলে, গ্রহটির বায়ুমণ্ডল 5000 km পর্যন্ত বিস্তৃত।গ্রহটিতে মেঘের স্তর দেখতে পাওয়া যায় 1-10atm অঞ্চলে, যেখানকার তাপমাত্রা 200-320 K.

গ্রহটির বহিঃস্থ বায়ুমণ্ডল 75% H2 এবং 24% He দিয়ে তৈরি।ভয়েজার ও অন্যান্য স্পেসক্রাফট, হাবল টেলিস্কোপ এবং মানমন্দিরগুলোর রিমোট সেন্সিং পর্যবেক্ষণ থেকে বাকি 1% উপাদানও শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। বৃহস্পতির প্রায় 50 km গভীর মেঘের স্তরকে অন্তত দুটো অংশে ভাগ করা হয়েছে- নিচে থাকা পুরু বরফের স্তর, এবং তার ওপরে থাকা অ্যামোনিয়া ও অ্যামোনিয়াম হাইড্রোসালফাইড ক্রিস্টালের তৈরি তুলনামূলক পাতলা ও স্বচ্ছ স্তর।আর এ যৌগগুলোর ফাঁকে ছড়িয়ে আছে প্রচুর অণু-পরমাণু।

জোভিয়ান বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে ভালো ছবি পাওয়া গেছে শুধু গ্যালিলিও প্রোবের করা 'vertical analysis' থেকে।গন্তব্যে পৌঁছানোর পাঁচ মাস আগে গ্যালিলিও স্পেসক্রাফট থেকে একটি প্রোব ছোঁড়া হয়।প্রোবটি গ্রহের বায়ুমণ্ডলে প্রায় 60,000 km/h বেগে প্রবেশ করে।221 g মন্দনে নিচের দিকে নামতে শুরু করার ৫৮ মিনিট পরে সেটি সিগনাল পাঠানো বন্ধ করে দেয়।সে সময়ে জুপিটারের আবহাওয়া ছিলো মেঘাচ্ছন্ন, চাপ 22atm এবং ফুটন্ত 153 °C।

গ্যালিলিও প্রোবে থাকা যন্ত্রপাতির মধ্যে ছিলো একটা Neutral Mass Spectrometer, সাথে যুক্ত ছিলো 2-150 amu রেঞ্জের একটা Quadrupole Analyzer।যন্ত্রের তথ্য বিশ্লেষণ এবং হিসাবনিকাশের সাথে ল্যাবের পরীক্ষানিরীক্ষায় পাওয়া তথ্য-উপাত্ত মিলিয়ে দেখা যায়, দৃশ্যমান মেঘস্তরের নিচে রয়েছে বিভিন্ন মৌল ও যৌগের এক জটিল মিশ্রণ।

উদাহরণস্বরূপ, দেখা যায় যে বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোজেনের তুলনায় আর্গন, ক্রিপটন আর জেননের প্রাপ্যতা, সূর্যের তুলনায় ২ থেকে ৩ গুণ বেশি।পাশাপাশি মিথেন, ইথেন, ইথিলিন, প্রোপেন, হাইড্রোজেন সালফাইড, সামান্য পরিমাণে চার কার্বনবিশিষ্ট হাইড্রোকার্বন, কার্বন-নাইট্রোজেন যৌগ, ফসফিন, হাইড্রোক্লোরিক এসিড এবং বেনজিনের সম্ভাব্য উপস্থিতির কথাও জানা যায়।যতক্ষন তাপমাত্রা এবং চাপ সহনীয় মাত্রায় থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত এসব যৌগের ঘনত্ব বায়ুমণ্ডলের গভীরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়তে থাকে।

এবার জুপিটারের রঙ আর তার পিঠের মস্ত বড় লাল বিন্দু নিয়ে আলাপ করা যাক।গ্রহটির বিখ্যাত লাল বিন্দু আসলে গড় মেঘস্তরেরও অনেক নিচ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি অতি শক্তিশালী ঝড়ের লম্বা কলাম।আর ঝড়টির রঙ শুধুমাত্র লাল নয়, বরং হলদে-বাদামী, সাদা এবং নীল-সবুজও হতে পারে, তবে লাল ও বাদামী রঙের আধিক্যের অন্যতম সম্ভাব্য কারণ হলো পলিমারিক সালফার যৌগ।উদাহরণস্বরূপ, অ্যামোনিয়াম হাইড্রোসালফাইডের (বায়ুমণ্ডলের অন্তর্বর্তী মেঘে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান) উপরে তাপমাত্রা ও রেডিয়েশনের প্রভাব সম্পর্কিত এক গবেষণায় দেখা যায়, 10 K তাপমাত্রায় এই বর্ণহীন লবণটি লাল-বাদামী বর্ণের যৌগ উৎপন্ন করে, যার মাঝে HS_2^-, S_2^{2-}এবং S_6^- উপস্থিত এবং 410-480 nm দৈর্ঘের তরঙ্গ শোষণ করে।

আরেকটা থিওরি অনুযায়ী, বৃহস্পতির লাল ও বাদামী রঙ আসে অ্যামোনিয়া আর অ্যাসিটিলিনের আলোকরাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন যৌগ থলিন থেকে (সাধারণ অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন এবং অ্যামোনিয়ার আলোকরাসায়নিক বিক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে থলিন উৎপন্ন হয়)।সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায় দেখা যায়, এসব গ্যাসীয় অবস্থার বিক্রিয়াগুলোতে উৎপাদ হিসেবে পাওয়া যায় পিগমেন্ট- যাতে অ্যালিফেটিক অ্যাজো, ডায়াজো অথবা অ্যাজিন যৌগ বিদ্যমান।তবে, থলিন-পাথওয়ে আসলে বিভ্রান্তিকর ও বিশৃঙ্খল একটা থিওরির দিকেই নির্দেশ করে।

জুপিটারের চারপাশে এখনো লাটিমের মতো ঘুরতে থাকা জুনো স্পেসক্রাফটের তোলা ছবি থেকে দেখা যায় গ্রহের মেরুদ্বয়ের অসাধারণ ক্রম-ঘূর্ণায়মান নীল সাইক্লোন।এই রং আসে কোথা থেকে? এর উত্তরও পাওয়া যেতে পারে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোসালফাইডের আলোকরসায়ন বিক্রিয়ায়।এই লবণকে 160 K তাপমাত্রায় আলোতে রাখা হলে উৎপন্ন হয় একটি নীল-সবুজ যৌগ, যার পরিচয় UV-বর্ণালি থেকে পাওয়া যায় অ্যানায়ন র‍্যাডিকাল $S_3^{\bullet-}$ হিসেবে।

গ্যাস-দানবের আপাত উজ্জ্বলতার বেশিরভাগই আসে সূর্যের প্রতিফলিত আলো থেকে।তবে কোনোভাবে যদি সূর্যের আলোর উজ্জ্বলতা কমিয়ে দেওয়া যায়, দেখা যায় যে পৃথিবীর মতো বৃহস্পতিও নিজস্ব তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ বিকিরণ করে।সাধারণভাবে এই বিকিরণ পৃথিবীর মতো হলেও, রসায়নটা এলিয়েন!

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় গ্রহটির মেরুজ্যোতির কথা।বৃহস্পতির শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ চৌম্বকক্ষেত্র এবং দ্রুত আহ্নিক গতির (9.925 ঘণ্টা) ফলে সৃষ্ট বিশাল চৌম্বকমণ্ডল আর মেরুজ্যোতি পৃথিবীর চেয়ে হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী।তাই পৃথিবীর বাইরে অন্য যে গ্রহে প্রথম চৌম্বকমণ্ডল এবং মেরুজ্যোতি আবিষ্কৃত হয়েছে সেটি জুপিটার। তবে এই দুই গ্রহের মেরুজ্যোতির মধ্যে মৌলিক গুণগত পার্থক্য বিদ্যমান।

আমাদের গ্রহে মেরুজ্যোতির উৎস আয়নিত পারমাণবিক অক্সিজেন (লাল ও সবুজ রঙ) এবং নাইট্রোজেন অণু (নীল রঙ)।সোলার উইন্ডের উচ্চশক্তিসম্পন্ন কণা অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেনের আয়নিকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।তবে জোভিয়ান সিস্টেমের মেরুজ্যোতি সৃষ্টিতে এই প্রক্রিয়া কোনো কাজেই লাগে না।এর কারণ পৃথিবীর তুলনায় বৃহস্পতি ও সূর্যের দূরত্ব পাঁচগুণ বেশি, আর গ্রহটির শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র সোলার উইন্ডকে এর বায়ুমণ্ডলের আশেপাশে ঘেঁষতে দেয় না।

এর পরিবর্তে, মেরুজ্যোতি সৃষ্টিতে জুপিটারের নিজস্ব উচ্চশক্তিসম্পন্ন কণার উৎস হলো এর সবচেয়ে কাছের তিনটি গ্যালিলিয়ান চাঁদ।ভয়াবহ দূষক প্রতিটি চাঁদই নিজের অরবিটে গাদাখানেক নিউট্রাল অণু ও পরমাণু নিঃসরণ করে। জুপিটারের এক্সরে এমিশন (এক্সরে উৎপন্ন হয় বায়ুমণ্ডলীয় নিউক্লিয়াস থেকে ছড়িয়ে যাওয়া উচ্চশক্তির ইলেকট্রন থেকে সৃষ্ট ব্রেমসস্ট্রাহলাং রেডিয়েশন থেকে) থেকে সৃষ্ট উচ্চশক্তির ইলেকট্রনের সাথে সংঘর্ষের ফলে, পাশাপাশি যে সামান্য পরিমাণে সোলার উইন্ড চৌম্বকমণ্ডলকে ছেদ করতে পারে, তার জন্য এসব নিউট্রাল কণা আয়নিত হয়ে যায়।এভাবে প্রতিটি গ্যালিলিয়ান চাঁদ থেকে নির্গত হয় প্লাজমা টোরি।

যদিও চাঁদগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্লাজমা উৎস হিসেবে ভূমিকা পালন করে, মেরুজ্যোতি সৃষ্টিতে এদের গুরুত্ব আরো বেশি এবং সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে।তুলনামূলক ধীর আহ্নিক গতির কারণে নিজেদের তৈরি প্লাজমা ট্রেইলেই এরা বাধা হয়ে দাঁড়ায়।আর এসব প্লাজমা ট্রেইল আরোও দ্রুত ঘূর্ণায়মান জুপিটার ও তার চৌম্বকমণ্ডলের জন্য ত্বরণ লাভ করে।ফলস্বরূপ, বিচ্যুত হওয়া প্লাজমা আর চাঁদের চৌম্বকক্ষেত্র, আল্ফভেন তরঙ্গ হিসেবে জুপিটারের চৌম্বকক্ষেত্র বরাবর গতি লাভ করে।
গ্যাস-দানবের চারপাশে ঘুরতে থাকা জুনো স্পেসক্রাফটের 'Jovian Infrared Auroral Maping (JIRAM) imaging spectrometer' এখন পর্যন্ত গ্রহটির মেরুজ্যোতি সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো তথ্য দিয়েছে।জুপিটারের মেরুজ্যোতি হলো এর উপগ্রহের ফুটপ্রিন্ট আর আনুষঙ্গিক প্লাজমা ট্রেইলের যোগফল-আল্ফভেন তরঙ্গের সৃষ্ট ছায়া এবং গ্রহটির স্বকীয় মেরুজ্যোতির যোগফল।

জুপিটারের নিকটতম ও বৃহত্তম দূষক, আইও, অসংখ্য আগ্নেয়গিরি থেকে মহাশূন্যে ক্রমাগত সালফার ডাই অক্সাইডের মতো গ্যাস নিঃসরণ করে চলেছে।আর দুই গ্যালিলিয়ান চাঁদ ইউরোপা আর গ্যানিমিড, কিছুটা কম পরিমাণে হলেও গ্যাস-দানবের দিকে ছুঁড়ে দেয় বিভিন্ন জলীয় দ্রবণ।এক্সাইটেড সালফার আর অক্সিজেন থেকে সরাসরি সৃষ্ট মেরুজ্যোতি তুলনামূলক হালকা বা ফ্যাকাশে দেখতে।চাঁদগুলো থেকে আসা উচ্চশক্তির 'precipitating' ইলেকট্রন জুপিটারের হাইড্রোজেনের সাথে বিভিন্ন উপায়ে বিক্রিয়া করে।

প্রাথমিকভাবে, হাইড্রোজেন অণু আয়নিত হয়ে H2+ এ পরিণত হয়, যা পরবর্তীতে নিউট্রাল হাইড্রোজেন অণুর সাথে বিক্রিয়া করে ট্রাইহাইড্রোজেন ক্যাটায়ন (H3+, সবচেয়ে সহজ ট্রাইঅ্যাটমিক আর three-centered, two electron bond এর উদাহরণ) আর আণবিক হাইড্রোজেন গঠন করে।H3+ আন্তঃমহাকাশে স্থিতিশীল হলেও জোভিয়ান আবহাওয়ায় ১৫ মিনিটের মধ্যে ক্ষয় হয়ে যায়, তবুও মেরুজ্যোতি সৃষ্টি করতে আয়নটির জন্য তা যথেষ্ট সময়।যাইহোক, আমাদের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন-সৃষ্ট মেরুজ্যোতির বিপরীতে জুপিটারের H3+-সৃষ্ট মেরুজ্যোতি তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গের IR অংশে তীব্র বর্ণালি দেয়।সংক্ষেপে, পৃথিবীর তুলনায় বৃহস্পতির মেরুজ্যোতি আকারে আরোও বড়, আরোও জটিল এবং দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যে ঘটে।

বৃহস্পতি, তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গের দৃশ্যমান অঞ্চলেও বর্ণালি দেয়।সুনির্দিষ্টভাবে বলতে, গ্রহটায় লাল রঙের বিদ্যুৎচমক দেখা যায়, যার সর্বোচ্চ তীব্রতা পাওয়া যায় আণবিক হাইড্রোজেনের H-α (656.3 nm) লাইনে। বছরজুড়ে অনেকগুলো মিশনেই গ্রহটির বিদ্যুৎচমক নিরীক্ষণ করা হয়েছে, তবে জুনো স্পেসক্রাফট আর এর স্টেলার রেফারেন্স ইউনিট- একটা ব্রডব্যান্ড (450-1100 nm) ইমেজার- সাম্প্রতিক সময়ে আরোও তথ্য দিয়েছে, যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে আরো নতুন নতুন প্রশ্নের।পূর্ববর্তী বর্ণালি বিশ্লেষণ করে ধারণা করা হয়েছিলো, পর্যবেক্ষিত বিদ্যুৎচমক 5 atm বায়ুমণ্ডল স্তরে ঘটে।এই স্তর বরফের ক্রিস্টাল ও মিহি তুষারকণা, দুই অবস্থাতেই থাকার জন্য যথেষ্ট উষ্ণ।

আদর্শ আপড্রাফটে মিহি তুষারকণা নিচে পড়ে যাওয়ার মতো ভারী, আর পড়ে যাওয়ার সময় উর্ধ্বগামী বরফ ক্রিস্টালের গা ঘেঁষে যায়।এটি চার্জ সেপারেশনের আদর্শ ইনডাক্টিভ মেকানিজম, আর এর ফলেই বিদ্যুৎ চমকায়। জুনো যে বিদ্যুৎচমক পর্যবেক্ষণ করেছিলো তা 1-2 atm স্তরেও ঘটে, যেখানের পরিবেশ অতি শীতল পানির তাপমাত্রার চেয়েও ঠাণ্ডা (-66 °C এর চাইতেও কম)! তাহলে এখানে আসলে কী ঘটছে?

একটি সম্ভাবনা হলো, অ্যামোনিয়া শক্তিশালী অ্যান্টিফ্রিজ হিসেবে কাজ করে, আর একটা অ্যামোনিয়া-পানি তরল তুষারকণার বিকল্প হিসেবে কাজ করে।এছাড়া, আরেকটি সম্ভাবনা হলো, বিভিন্ন আকৃতির বরফের টুকরোর জন্যই গ্রহটিতে বিদ্যুৎ চমকায়।এই সম্ভাবনার ইঙ্গিত এসেছে পৃথিবীর বজ্রবৃষ্টির কিউমুলোনিম্বাস মেঘের বরফাচ্ছন্ন উর্ধ্বাংশ বা অ্যানভিলের স্টাডি থেকে।যদিও এরকম বরফ-বরফ মেকানিজম এখনো বিতর্কিত, এবং পৃথিবীতে এর বিশদ গবেষণা হওয়া দরকার।

১. আপাত মান (apparent magnitude)- পৃথিবী থেকে একটি জ্যোতিষ্কের উজ্জ্বলতা যতটুকু দেখা যায় তার পরিমাপ হলো আপাত মান বা আপাত উজ্জ্বলতা।একটি জ্যোতিষ্ক যত উজ্জ্বল, তার আপাত মান তত কম।
২. সংকটবিন্দু (critical point)- প্রকাশ করা হয় সংকট চাপ ও তাপমাত্রা দিয়ে।সংকট তাপমাত্রার ওপরে কোনো গ্যাসকে চাপ প্রয়োগ করে তরলে পরিণত করা যায় না।
৩. গ্যালিলিও স্পেসক্রাফট (Galileo spacecraft)- এই আমেরিকান রোবোটিক স্পেস-প্রোবটি জুপিটার আর এর উপগ্রহগুলোকে স্টাডি করতো।জুপিটারকে প্রদক্ষিণ করা প্রথম এই স্পেসক্রাফটে ছিলো একটি অরবিটার আর একটা এন্ট্রি প্রোব।
৪. গ্যালিলিয়ান চাঁদ (galilean moons)- বৃহস্পতির সবচেয়ে বড় চারটি উপগ্রহ- আইও, ইউরোপা, গ্যানিমিড আর ক্যালিস্টো।গ্যালিলিও গ্যালিলি এগুলোকে প্রথম দেখে বৃহস্পতির উপগ্রহ হিসেবে চিহ্নিত ও নামকরণ করেন।
৫. ব্রেমসস্ট্রাহলাং রেডিয়েশন (Bremsstrahlung radiation)- আরেকটি চার্জিত কণার উপস্থিতির জন্য কোনো চার্জিত কণার মন্দন ঘটলে যে তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ পাওয়া যায়।
৬. প্লাজমা টোরি (plasma tori)- কোনো গ্রহকে ঘিরে থাকা গ্যাস বা প্লাজমার টরয়ডাল (toroidal) আকৃতির মেঘ।সৌরজগতে, গ্যাস বা প্লাজমা টোরি সৃষ্টি হয় কোনো উপগ্রহের বায়ুমণ্ডলের সাথে তার গ্রহের চৌম্বকক্ষেত্রের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে।
৭. আল্ফভেন তরঙ্গ (Alfvén wave)- ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইনামিক তরঙ্গ, প্লাজমার মধ্যে উৎপন্ন হয় চৌম্বকক্ষেত্র ও তড়িৎপ্রবাহের মিথস্ক্রীয়ার জন্য।
৮. Precipitating ইলেকট্রন- (পৃথিবীর ক্ষেত্রে) সোলার উইন্ড থেকে আসা ইলেকট্রন যা গ্রহের বায়ুমণ্ডলে আটকে যায় ও বিক্রিয়া করে।
৯. আপড্রাফট (updraft)- গ্যাস বা বাতাসের উর্ধ্বমুখী চলন।
১০. অ্যান্টিফ্রিজ (antifreeze)- তরল পদার্থে মেশানো হয় এর গলনাংক কমানোর জন্য।

ChemFusion
www.chemfusion.net

শনি

আমাদের সৌরজগতের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর গ্রহের কথা যদি বলা হয়, তাহলে পৃথিবীর পর নিশ্চিতভাবেই শনির নাম আসবে।কারণ এর রয়েছে এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা সৌরজগতের অন্য কোন গ্রহে সাধারণত দেখা যায়না।অনিন্দ্য সুন্দর বলয় দ্বারা শনি গ্রহটি বেষ্টিত, যার জন্য গ্রহটি আবিষ্কারের পর থেকেই জ্যোতির্বিদদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

ধারণা করা হয়, শনির কোনো উপগ্রহ কিংবা অন্য কোন গ্রহাণু শনির কাছাকাছি আসায় এর শক্তিশালী মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে এই বলয় গঠন করেছে।পাইওনিয়ার-১১ এবং ভয়েজার স্পেসক্রাফটের পাঠানো ছবি ও তথ্যমতে জানা যায়, শনির বলয় বরফের কেলাস, ধুলিকণা ও বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদান দ্বারা গঠিত।

শনির অভ্যন্তরীণ গঠন রহস্যে পরিপূর্ণ।এর অভ্যন্তরে রয়েছে বিশাল গ্যাসের সমুদ্র।যার মধ্যে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের আধিক্য রয়েছে।অভ্যন্তরে অত্যধিক চাপের কারণে হাইড্রোজেন গ্যাস তরল অবস্থায় থাকে। এছাড়াও মিথেন, অ্যামোনিয়া গ্যাসও বিদ্যমান সেখানে।ধাতুর মধ্যে প্রধানত লোহা, নিকেল ও অন্যান্য পাথুরে বস্তু লক্ষণীয়।

শনি একটি গ্যাসীয় গ্রহ হওয়ায় এটি খুবই হালকা।অধিক পরিমাণ হাইড্রোজেন গ্যাস থাকার কারণে এটির ঘনত্ব পানির চেয়েও কম হয়।তার মানে আমরা যদি শনিগ্রহের সমান একটা বাথটাবে পানি রাখি, তাহলে গ্রহটিকে সেখানে ভাসানো সম্ভব হবে!

গ্রহটির আবহাওয়া মোটেও শান্তিপূর্ণ নয়।এখানে নিয়মিত ঝড় ঝঞ্ঝা সংঘটিত হয়।কখনো বাতাসের বেগ প্রায় ১৮০০ কিমি/ঘন্টাও হতে পারে।তবে উপরিভাগে বেগ তুলনামূলক কম।

শনি গ্রহে অত্যন্ত শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র বিদ্যমান যা সৌরজগতের মধ্যে দ্বিতীয়।এর কারণে গ্রহটি উচ্চশক্তির তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ করতে পারে।শনির চৌম্বকক্ষেত্র ও বায়ুমণ্ডলের আন্তঃক্রিয়ার ফলে এর মেরুতে অরোরা দেখা যায়।

ChemFusion
www.chemfusion.net

টাইটান

টাইটান শনির বৃহত্তম চাঁদ এবং সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রাকৃতিক উপগ্রহ।এটি একমাত্র চাঁদ যার ঘন বায়ুমণ্ডল রয়েছে ।টাইটানের পৃষ্ঠ থেকে শনি ৫.০৯ ডিগ্রি একটি চাপ দেয় এবং এটি যদি চাঁদের ঘন বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান হত তবে পৃথিবী থেকে চাঁদের চেয়ে আকাশে ১১.৪ গুণ বড় হিসেবে প্রদর্শিত হবে।

টাইটান মূলত বরফ এবং পাথুরে পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত যা সম্ভবত বরফের বিভিন্ন স্তর দ্বারা বেষ্টিত একটি পাথুরে মূলের মধ্যে পৃথকীকৃত।এর মধ্যে বরফের একটি ভূত্বক এবং অ্যামোনিয়া সমৃদ্ধ তরল জলের একটি উপগ্রহ স্তর রয়েছে।২০০৪ সালে ক্যাসিনি – হিউজেনস মিশন টাইটানের তরল হাইড্রোকার্বন হ্রদ আবিষ্কারসহ নতুন তথ্য সরবরাহ করার পূর্বে ঘন অস্বচ্ছ বায়ুমণ্ডলের কারণে টাইটানের পৃষ্ঠকে বোঝা মুশকিল ছিল।

এর মেরু অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিকভাবে তরুণ পৃষ্ঠটি সাধারণত মসৃণ, কিছু অংশে খাঁজকাটা, যদিও পর্বতমালা এবং বেশ কয়েকটি সম্ভাব্য ক্রায়োভলকানো এর সন্ধান পাওয়া গেছে।

টাইটানের বায়ুমণ্ডলের মূল উপাদান নাইট্রোজেন; অল্প পরিমানে রয়েছে মিথেন এবং ইথেন মেঘ যা মাঝে মধ্যে ভারী অর্গানোনাইট্রোজেন ধোঁয়া গঠন করে।এই উপগ্রহের বায়ু এবং বৃষ্টিপাতসহ জলবায়ু পৃথিবীর অনুরূপ ভূ-পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্য তৈরি করে, যেমন টিলা, নদী, হ্রদ, সমুদ্র (সম্ভবত তরল মিথেন এবং ইথেনের)। বিদ্যমান তরলগুলো (উপরিভাগ এবং উপগ্রহ উভয়) এবং শক্ত নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডল সহ টাইটানের মিথেন চক্র পৃথিবীর জলচক্রের সাথে এক আকর্ষণীয় সাদৃশ্য প্রদর্শন করে, যদিও এটি প্রায় ৯৪ কেলভিন তাপমাত্রায় থাকে।

ChemFusion
www.chemfusion.net

টাইটানের জাদুকরী দ্বীপ

শনি গ্রহের বৃহত্তম ও সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম উপগ্রহ হলো টাইটান (Titan)।২০০৪ সালের ৩০ শে জুন শনি গ্রহ ও তার উপগ্রহসমূহ নিরীক্ষণের জন্য নাসা থেকে প্রেরিত হয় 'ক্যাসিনো' মহাকাশযান তার এই যাত্রায় টাইটান উপগ্রহের বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় মহাকাশযানটি।জানা গেছে,আমাদের গ্রহের বাইরে সৌরজগতেটাইটানই একমাত্র উপগ্রহ যেখানে নিবিড় আবহাওয়া এবং পৃথিবীর ন্যায় তরল পৃষ্ঠদেশের নজির পাওয়া যায়।তবে এই তরল পৃষ্ঠদেশের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে কিছু উদ্ভট বৈশিষ্ট্য।এই পৃষ্ঠদেশগুলোকে দেখা গেছে কিছু আকার পরিবর্তনকারী জাদুকরী দেশ হিসেবে।তবে কি সত্যিই এখানে কোন জাদুকরী প্রভাব রয়েছে! না, এখানে মূলত সংশ্লিষ্ট রয়েছে কিছু রসায়ন।চলুন, জেনে নেয়া যাক!

টাইটানের জাদুকরী দ্বীপগুলো তার বিজ্ঞানীদের কৌতূহলের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয় যা শেষ পর্যন্ত গবেষণাতে গড়ায়। ক্যাসিনোর তথ্য অনুযায়ী টাইটানের কিছু হাইড্রোকার্বনপূর্ণ সমুদ্রে দ্বীপগুলোকে দেখা গেছে।অনুমান করা হয় যে, দ্বীপগুলোর এই গঠন পরিবর্তনকারী বৈশিষ্ট্যের জন্য মূলত দায়ী নাইট্রোজেন গ্যাসের বুদবুদ।তবে কীভাবে টাইটান উপগ্রহে না গিয়েও পৃথিবীতে বসে এর তরল পৃষ্ঠ নিয়ে গবেষণা করা যায়?

এজন্য আমাদের বুদ্ধিমান বিজ্ঞানীগণ ল্যাবরেটরিতেই কৃত্রিম উপায়ে/কৃত্রিমভাবে ৩২০০ মাইল পৃষ্ঠদেশের, হাইড্রোকার্বনপূর্ণ, ৯৮% নাইট্রোজেন গ্যাসের ঘন আবহাওয়ারঅনুরূপ শীতল পরিবেশ সৃষ্টি করে (NASA'S JET Propulsion laboratory)।ল্যাবরেটরিতে নাইট্রোজেন গ্যাসের দ্রাব্যতা নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয় যে, সমুদ্রপৃষ্ঠে নাইট্রোজেন গ্যাসের বুদবুদ সৃষ্টি সম্ভব।তবে কীভাবে নাইট্রোজেন গ্যাসের বুদবুদ সৃষ্টি হয়?

এর ব্যাখ্যা অতি সহজ।কোমল পানীয়ের সাথে নিশ্চয়ই আমরা সবাই পরিচিত?কোমল পানীয়ের বোতলের ছিপি হঠাৎ খুলে ফেললে চাপের পরিবর্তনের ফলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বুদবুদ আকারে বেরিয়ে আসে।ধারণা করা হয় যে, টাইটান উপগ্রহে মিথেন বৃষ্টি নদীর সাহায্যে প্রবাহিত হয়ে ইথেনযুক্ত তরলের হ্রদ ও সমুদ্রে পৌঁছায় এবং পানিতে দ্রবীভূত হয়।এভাবে মিথেনপূর্ণ তরলের সাথে ইথেনসমৃদ্ধ তরলের মিশ্রণের ফলে নাইট্রোজেন গ্যাসের অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হয়।এতে চাপ, তাপমাত্রা অথবা অন্য কোন পরিবর্তনের কারণে নাইট্রোজেন গ্যাসের বুদবুদ সৃষ্টি হয়ে থাকে।বিজ্ঞানীদের মতে এ অবস্থার কারণে নাইট্রোজেন গ্যাসের দুমুখী এক প্রবাহের সৃষ্টি হয়।ফলশ্রুতিতে হ্রদসমূহ যখন উত্তপ্ত হয় তখন তরলের নাইট্রোজেন গ্যাস বাষ্পীভূত হয়।অন্যদিকে, হ্রদসমূহ শীতল হলে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে।

তবে আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে, এই নাইট্রোজেনপূর্ণ পরিবেশ ভবিষ্যতে টাইটান পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরিত কোন রোবটিক যানের জন্য বাধাস্বরূপ হতে পারে।উদাহরণস্বরূপ, গ্যাসের বুদবুদের কারণে সৃষ্ট তাপমাত্রা প্রপেলারের জন্য সমস্যার কারণ হতে পারে।যাই হোক, এই নিরীক্ষা নাইট্রোজেনের দ্রাব্যতা গবেষণায় সহায়ক ছিল যা পরবর্তী অনেক গবেষণায় কাজে লাগে।

ইউরেনাস

ইউরেনাস সৌরজগতের শীতলতম গ্রহ।এ গ্রহের ভরের বেশিরভাগ (৮০ শতাংশ বা তারও বেশি) ছোট পাথরে গঠিত।মূল অংশের (**Core**) উপরে পানি, মিথেন এবং অ্যামোনিয়া-এর একটি ঘন তরল এর আবরণ রয়েছে।মূল অংশের কাছাকাছি, এটি ৯,০০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট (৪,৯৮২ ডিগ্রি সেলসিয়াস) পর্যন্ত উত্তাপ দেয়।

বায়ুমন্ডলে মিথেন গ্যাস থেকে ইউরেনাস তার নীল-সবুজ রং পেয়েছে।সূর্যের আলো বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে যায় এবং ইউরেনাসের মেঘের শীর্ষে প্রতিফলিত হয়।মিথেন গ্যাস আলোর লাল অংশটি শোষণ করে, যার ফলে নীল-সবুজ রং দেখা যায়।

বরফ দানবটি তার কক্ষপথের সমতল থেকে প্রায় ৯০-ডিগ্রি কোণে বেঁকে ঘুরে।এই বৈশিষ্ট্য একে অন্যান্য গ্রহগুলোর থেকে ব্যতিক্রমী করে তুলেছে।গ্রহটিকে ঘিরে রয়েছে ১৩টি বিশাল আকৃতির রিং এবং ২৭ টি ছোট উপগ্রহ। ইউরেনাসের আবিষ্কৃত ২৭ টি উপগ্রহই অর্ধেকটা বরফ ও অর্ধেক শিলা দ্বারা তৈরী।এই গ্রহটির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তাপমাত্রা, চাপে যেকোনো জীবের জন্য খাপ খাইয়ে নেয়া অসম্ভব।

নেপচুন

নেপচুন সৌরজগতের সবচেয়ে ঘন দানবাকৃতির গ্রহ।এর বায়ুমন্ডল মূলত হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম সমন্বিত, হাইড্রোকার্বন এবং সম্ভবত কিছু নাইট্রোজেনবিশিষ্ট যৌগ রয়েছে, যদিও এতে পানি অ্যামোনিয়া এবং মিথেন এর বরফের উচ্চ অনুপাতে উপস্থিতি দেখা যায়।তবে, ইউরেনাসের মতো এর অভ্যন্তর প্রাথমিকভাবে বরফ এবং শিলা দ্বারা গঠিত; ইউরেনাস এবং নেপচুনকে সাধারণত এই কারণেই "বরফ দৈত্য" হিসেবে বিবেচনা করা হয়।নেপচুনের বাইরের অঞ্চলগুলোতে মিথেনের চিহ্ন গ্রহের নীল বর্ণের কারণ হিসাবে ধরা হয়, যদিও কোনও অজানা উপাদানের কারণে ইউরেনাসের তুলনায় নেপচুন কিছুটা গভীর নীল হিসাবে বিবেচিত।নেপচুনের মূল অংশটি সম্ভবত আয়রন, নিকেল এবং সিলিকেট এর সমন্বয়ে গঠিত।

এর কেন্দ্রের চাপ প্রায় ৭ এমবার যা পৃথিবীর কেন্দ্রের তুলনায় দ্বিগুণ এবং তাপমাত্রা ৫,৪০০ কেলভিন হতে পারে।

ট্রাইটন

ট্রাইটন নেপচুনের ১৩ টি চাঁদের মধ্যে বৃহত্তম।এটি ব্যতিক্রম কারণ এটি আমাদের সৌরজগতের একমাত্র বৃহৎ চাঁদ যা তার গ্রহের ঘূর্ণনের বিপরীত দিকে প্রদক্ষিণ করে অর্থাৎ একটি প্রতিবিম্বিত কক্ষপথ ব্যবহার করে।
বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ট্রাইটন হলো একটি কুইপার বেল্ট যা কয়েক বছর আগে নেপচুনের মহাকর্ষ দ্বারা ধরা পড়ে। এটির সঙ্গে কুইপার বেল্টের জন্য সর্বাধিক পরিচিত প্লুটোর অনেক মিল রয়েছে।
আমাদের নিজস্ব চাঁদের মতো, ট্রাইটনের গতিপ্রকৃতি নেপচুনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন— এক দিক সর্বদা গ্রহের মুখোমুখি।তবে এর অস্বাভাবিক কক্ষপথ প্রবণতার কারণে এর উভয় মেরু অঞ্চল সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে।
ট্রাইটনের ব্যাস ১,৬৮০ মাইল (২,৭০০ কিলোমিটার)।মহাকাশযানের চিত্রগুলো দেখায় যে চাঁদের একটি ক্ষুদ্র ক্রেটযুক্ত পৃষ্ঠ রয়েছে যা মসৃণ আগ্নেয় জলের সমতল এবং বৃত্তাকার লাভা প্রবাহ দ্বারা গঠিত গোলাকার পিটের সম্বন্বয়ে তৈরি।ট্রাইটনের বরফ আচ্ছাদিত পৃষ্ঠের উপর রয়েছে হিমশীতল নাইট্রোজেনের আবরণ যা আবার আবৃত করে রাখে বিভিন্ন পাথর ও ধাতব খন্ডে গঠিত মূল অংশটিকে।ট্রাইটনের ঘনত্ব পানির দ্বিগুণ।ট্রাইটনের অভ্যন্তরীণ শিলার পরিমাণ শনি ও ইউরেনাসের উপগ্রহগুলোর চাইতে অনেক বেশি।

এর পাতলা বায়ুমণ্ডল মূলত নাইট্রোজেন এবং স্বল্প পরিমাণে মিথেন দিয়ে গঠিত।এই বায়ুমণ্ডলটি সম্ভবত ট্রাইটনের আগ্নেয়গিরির ক্রিয়াকলাপ থেকে উদ্ভূত, যা সূর্যের মৌসুমী উত্তাপ দ্বারা চালিত হয়।ট্রাইটন, আইও এবং শুক্র পৃথিবী ছাড়াও সৌরজগতের একমাত্র উপাদান যা বর্তমান সময়ে আগ্নেয়গিরি রূপে সক্রিয় বলে পরিচিত।
আবার, এটা এতটাই শীতল যে ট্রাইটনের নাইট্রোজেনের বেশিরভাগ অংশ হিম হিসাবে সংশ্লেষিত হয় এবং এর পৃষ্ঠকে একটি বরফের আচ্ছাদন দেয় যাতে ৭০ শতাংশ সূর্যালোক আঘাত করতে পারে।

যাইহোক,এস্ট্রোকেমেস্ট্রি বা জ্যোতির্সায়নের পরিধি বিশদ এবং বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে দিনদিন আরো নতুন তথ্য,উপাত্ত বেরিয়ে আসছে।
সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো,মহাকাশের একটি বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইলে স্বাভাবিকভাবেই আরো অনেকগুলো বিষয় চুম্বকের মতো টানতে থাকে, রহস্য উদঘাটনের জন্য মরিয়া করে তুলে।

ছিলিয়াম
জ্যোতিরসায়ন

ChemFusion
www.chemfusion.net

ইউরেনাস-নেপচুনে হীরক বৃষ্টি

বৃষ্টির সাথে ঝরে পড়ছে হীরা- এমন দৃশ্য কি কখনো কল্পনা করা যায়? ব্যাপারটা অনেকটা রূপকথার মতো শোনায়, তাই না? তবে এ কথা কি জানতেন যে জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং পদার্থবিদরা প্রায় ৪০ বছর ধরে অনুমান করে আসছেন যে নেপচুন ও ইউরেনাসে হীরাবৃষ্টি হয়ে থাকে? সৌরজগতের বহিঃস্থ গ্রহপুঞ্জ নিয়ে অধ্যয়ন অতি কষ্টসাধ্য ব্যাপার এবং এ উদ্দেশ্যে ভয়েজার-২ দ্বারা একটি মাত্র মিশন পরিচালিত হয়েছিল।তবে কীভাবে হীরাবৃষ্টির ধারণাটি এল?

সর্বপ্রথম লরেন্সের একজন গবেষক, মার্ভিন রস, ১৯৮১ সালে একটি আর্টিকেলের মাধ্যমে হীরাবৃষ্টির ধারণাটি প্রকাশ করেন।ইউরেনাস ও নেপচুনকে বলা হয় আমাদের সৌরজগতের 'দৈত্যাকার বরফ'।কী এই অদ্ভুত নামের কারণ? প্রকৃতপক্ষে এই গ্রহগুলোর বহিঃস্থ স্তর হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম দিয়ে গঠিত।পানি, অ্যামোনিয়া এবং মিথেন ইউরেনাস ও নেপচুনের কিছু প্রধান উপাদান যেগুলো এসব গ্রহকে বরফপূর্ণ করে তুলতে ভূমিকা রাখে।অন্য দিকে, মিথেনের উপস্থিতির কারণে গ্রহগুলোতে অপূর্ব নীলাভ আভার দেখা মিলে।তবে কীভাবে এখানে হীরা উৎপন্ন হয়ে থাকে? ধারণা করা হয়, অভিকর্ষজ বলের কারণে মধ্যস্তরে বরফের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়।উপরন্তু উচ্চ তাপমাত্রার কারণে গ্রহগুলোতে চাপ বৃদ্ধি পেয়ে পৃথিবীর চাপের ১ মিলিয়ন গুণ হয়ে যায়।এর ফলে বরফসমূহ উত্তপ্ত ও ঘন তরলে পরিণত হয়।এরূপ পরিবেশে অ্যামোনিয়া ও মিথেন বিক্রিয়ার পক্ষে উপযোগী হওয়ায় হাইড্রোকার্বনের কার্বন এবং হাইড্রোজেন পরমাণুসমূহ পৃথক হয় এবং কার্বন পরমাণুসমূহ গুচ্ছিত হয়ে কার্বনের সবচেয়ে স্থানীরূপ হীরাতে পরিণত হয়।এই হীরাসমূহ ভারী হওয়ায় বৃষ্টির সাথে ঝরে পড়ে।এই তত্ত্বটি বেশ চমকপ্রদ হলেও দূরবর্তী গ্রহপুঞ্জ থেকে হীরাবৃষ্টি পর্যবেক্ষণ ছিল অসম্ভব ব্যাপার।তবে কী এর সমাধান?

কেমন হয় যদি ল্যাবরেটরিতেই ইউরেনাস ও নেপচুনের আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়? ঠিক এ কাজটি করার মাধ্যমেই আমাদের বিচক্ষণ বিজ্ঞানীগণ স্ল্যাক ন্যাশনাল অ্যাক্সিলেটর ল্যাবরেটরিতে তাদের পর্যবেক্ষণ শুরু করেন।তারা পলিস্টিরিন প্লাস্টিকে শক ওয়েভ তৈরির মাধ্যমে উচ্চ তাপ ও চাপের সৃষ্টি করে।উচ্চশক্তিসম্পন্ন অপটিকাল লেজারের মাধ্যমে পলিস্টিরিনে তাপ প্রয়োগ করা হয়।এবার ফলাফলের পালা।

বিজ্ঞানীগণ বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করলেন যে হাইড্রোকার্বনসমূহ হীরাতে পরিণত হয়েছে! আনন্দিত হয়ে তারা এ হীরার গঠন বিশ্লেষণের কাজে লেগে পড়লেন।এক্সরে এর মাধ্যমে রাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহ ও রাসায়নিক কাঠামোসমূহ ধারণ করা হয়।পর্যবেক্ষণে দেখা গেল, প্রায় সবগুলো কার্বন পরমাণু কিছু অধিক প্রশস্ত ন্যানোমিটার হীরায় পরিণত হয়েছে। তারা এও অনুমান করলেন যে, গ্রহে উৎপন্ন হীরাসমূহ স্বচ্ছ ও সুগঠিত স্ফটিক নয়।এভাবেই রসায়নবিদ্যার কল্যাণে প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে যে, নেপচুন ও ইউরেনাসে হীরাবৃষ্টির ধারণাটিকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।এছাড়া হীরাবৃষ্টির ধারণার পক্ষে কিছু শক্তিশালী যুক্তি দাঁড় করানো যায়।উদাহরণস্বরূপ, হীরাসমূহ বৃষ্টির সাথে ঝরে পড়ার ফলে উচ্চ তাপমাত্রার সৃষ্টি হয় যা ইউরেনাস ও নেপচুনে উচ্চ তাপমাত্রার একটি কারণ।অন্য দিকে এসব গ্রহে চৌম্বকক্ষেত্র অপ্রতিসম এবং উদ্ভট ধরনের যার অন্যতম কারণ হতে পারে হীরাবৃষ্টির ফলে উদ্ভূত পার্শ্ববর্তী যৌগসমূহ।

এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসতে পারে, এ পরীক্ষার সার্থকতা কি শুধুই হীরাবৃষ্টি পর্যবেক্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল? না, নিউক্লিয়ার ফিউশনের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন, চিকিৎসা, ইলেকট্রনিকসহ বেশ কিছু ক্ষেত্রে এটি সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে।সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এই পরীক্ষাটির মাধ্যমে রসায়নের শক্তি ও কোন ঘটনার সত্যতা প্রমাণে রসায়নের গুরুত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

রহস্যময় প্লুটোয় নীল কুয়াশা

ChemFusion
www.chemfusion.net

সৌরজগতের অন্যতম রহস্যময় বামন গ্রহ হলো "প্লুটো"।পৃথিবী থেকে প্রায় ৪.৬৭ বিলিয়ন মাইল দূরের এই গ্রহটি পৃথিবী থেকে কয়েক গুণ ছোট, এমনকি চাঁদের থেকেও ছোট।

শীতল, কুয়াশাচ্ছন্ন, খুবই পাতলা স্তরবিশিষ্ট বায়ুমণ্ডল এবং অস্বাভাবিক ল্যান্ডস্কেপ প্লুটোর অনন্য বৈশিষ্ট্য।এছাড়াও এর বায়ুমণ্ডলে ২০ স্তরবিশিষ্ট নীল কুয়াশার উপস্থিতি প্লুটোকে রহস্যময় করে তুলেছে।নাসার New Horizon টিম প্লুটোর ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটার ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারলেও, সব বৈশিষ্ট্যের কারণ এখনো খুঁজে বের করতে সক্ষম হয় নি।আর তাই প্লুটো এখনো জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে এক রহস্যময় বস্তু!

প্লুটোর বায়ুমণ্ডলের প্রধান উপাদান নাইট্রোজেন (N_2, পরিমাণ সবচেয়ে বেশি), মিথেন (CH_4) এবং কার্বন মনোক্সাইড (CO)- বায়ুমণ্ডলে গ্যাসীয় অবস্থায় এবং ভূপৃষ্ঠে থাকা কঠিন অবস্থার মধ্যে সাম্যাবস্থায় বিরাজ করে।

প্লুটোর ভূপৃষ্ঠের প্রায় ৯৮% হলো নাইট্রোজেন বরফ এবং সামান্য পরিমাণে মিথেন ও কার্বন মনোক্সাইড এর বরফ।তাছাড়া ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা -২১০°সে. থেকে -২৩০°সে. এবং চাপও খুব কম।ভূপৃষ্ঠ হতে ৩০ কি.মি. উচ্চতা পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এরপর আবার কমতে থাকে।দিনের বেলায় তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে হিমায়িত নাইট্রোজেন ঊর্ধপাতিত হয় এবং রাতে তাপমাত্রা হ্রাসের ফলে পুনরায় হিমায়িত হয়ে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়।ফলশ্রুতিতে নাইট্রোজেনের বাতাস পুরো গ্রহে ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু এই বাতাস প্রবাহের দিক হলো প্লুটোর ঘূর্ণন দিকের বিপরীত দিকে।

New Horizon টিমের গবেষণা অনুযায়ী, প্লুটোর নীল কুয়াশা এর বায়ুমণ্ডলের সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে থাকে এবং এখানে হিমায়িত জৈব যৌগের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি।এই জৈব বরফের উপস্থিতিই প্লুটোর কুয়াশায় নীল রঙের জন্য দায়ী বলে বিবেচিত হয়েছে।মূলত প্লুটোর বায়ুমণ্ডলে থাকা যে সকল অত্যন্ত ক্ষুদ্র কণা নাইট্রোজেনের মতো ভূপৃষ্ঠে পতিত হওয়া থেকে নিজেকে বিরত রেখে দীর্ঘসময় ধরে বায়ুমণ্ডলে অবস্থান করতে পারে, তারাই সোলার রেডিয়েশনের জন্য পরবর্তীতে এই নীলাভ কুয়াশা সৃষ্টিতে দায়ী বরফে রূপান্তরিত হতে সক্ষম হয়।

এই কুয়াশার প্রধান উপাদানটি হলো একটি হিমায়িত জৈব যৌগ, বিউটা-1,3-ডাইইন বা ডাইএসিটাইলিন (C_4H_2) বরফ।প্লুটোর বায়ুমণ্ডলে সোলার রেডিয়েশন তীব্র জৈব ফটোকেমিস্ট্রি সৃষ্টির পরিবেশ তৈরী করে এবং বিভিন্ন র‍্যাডিকেল ও আয়ন সৃষ্টির মাধ্যমে বিভিন্ন জৈব গ্যাস উৎপন্ন করে।গ্রহের নিম্ন তাপমাত্রা, বিশেষত নিম্ন চাপ উৎপন্ন গ্যাসগুলোকে খুব দ্রুত ঘনীভূত হতে বাধ্য করে, যার ফলে উৎপন্ন জৈব বরফ এই বিশেষধর্মী কুয়াশা সৃষ্টি করে- যা প্লুটোর ভূপৃষ্ঠ হতে ২০০ কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত থাকতে দেখা গেছে।

C4H2 ছাড়াও প্লুটোর কুয়াশায় প্রোপাইন (C3H4) এবং বেনজিন (C6H6) বরফের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য।এছাড়া New Horizon টিম প্লুটোর বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে হাইড্রোজেন সায়ানাইড (HCN) বরফের উপস্থিতিও খুঁজে পেয়েছে।

প্লুটোর বায়ুমণ্ডলের আরও একটি বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞানীদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।তা হলো, প্লুটো তার কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার সময় যখন সূর্যের কাছাকাছি চলে আসে, তার বায়ুমণ্ডল অধিকতর পাতলা স্তরবিশিষ্ট হয়ে যায়। তবে বায়ুমণ্ডল ঠিক কতটুকু পাতলা হয় কিংবা এ ঘটনা কেন ঘটে, বিজ্ঞানীদের কাছে তা এখনো রহস্য হয়ে আছে!!

ChemFusion
www.chemfusion.net

মহাকাশে পানি

আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন (International Space Station- ISS) এর নাম আমরা কমবেশি সবাই শুনেছি। কিন্তু পৃথিবীর মাটি থেকে স্পেস স্টেশনে কোনোকিছুর পরিবহন ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা কয়জনই বা জানি! স্পেস স্টেশনে কিছু বহন করে নিয়ে যাওয়া বেশ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার।মহাকাশচারীদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে রসদ স্থানান্তরের অন্যতম অন্তরায়/বাধা হলো পরিবহন খরচ।একটি স্পেসএক্স রকেট নিক্ষেপ করতে পাউন্ড প্রতি ১৮০০ ডলারেরও বেশি অর্থ ব্যয় করতে হয়।মহাকাশচারীদের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর মধ্যে পানি অন্যতম প্রধান এবং বহন করে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে তা যথেষ্টই ভারী।

এই পানির চাহিদা মেটাতে হলে ট্যাঙ্ক এর পর ট্যাঙ্ক পানি ক্রমাগত স্পেস স্টেশনে বয়ে নেয়া দরকার, যেটা আদৌ সম্ভবপর নয়।এই বিড়ম্বনা থেকে বাঁচতে নভোচারীদের খাবার পানির যোগান আসে স্টেশনের একটি জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।যে প্রক্রিয়ায় স্টেশনের বাতাস থেকেও পানির শেষ বিন্দুটি আহরণ করে রিসাইক্লিং এর মাধ্যমে পরিশোধিত খাবার পানিতে রূপান্তর করা হয়।মহাকাশচারীরা যে খাবার পানি পান করে থাকেন তা আসলে তাদেরই ঘাম, গোসলের পরিত্যক্ত পানি এবং মূত্র থেকে পরিশোধিত পানির সমন্বয়।অবশ্য জরুরি প্রয়োজনে পানির চাহিদা মেটানোর জন্য সেখানে সবসময়ই প্রায় ২০০০ লিটার পানি সংরক্ষিত রাখা হয়।

আইএসএস এ পানি পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণে নাসা প্রদত্ত একটি ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়।এ প্রক্রিয়ায় সেখানকার গবেষণার জন্য নিয়ে যাওয়া বিভিন্ন প্রাণিসহ মহাকাশচারীদের নিশ্বাস, ঘাম এমনকি তাদের মূত্র থেকেও পানি সংগ্রহ করা হয়।সিংকের পরিত্যক্ত পানি, গোসলে ব্যবহৃত পানিও সেখানে পানি পুনরুৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়।এতে স্টেশনের খাবার পানির চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়।আইএসএসএর এই পানি ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আছেন Layen Carter।তিনি আলবামার মার্শাল ফ্লাইট সেন্টার এর সাথে যুক্ত রয়েছেন।তিনি বলেন, "এই পানির যোগান যে পরিশোধিত মূত্র আর ঘাম থেকে এসেছে সে কথা বেমালুম ভুলে যেতে পারলে পানির স্বাদ বোতলজাত খাবার পানির মতই মনে হয়।"

তবে এটি বেশ প্রচলিত পদ্ধতি হলেও আইএসএসএর মহাকাশচারীদের কেউ কেউ এই মূত্র পরিশোধিত পানি পান করে তাদের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে নারাজ।আইএসএস আসলে দুইটি আলাদা আলাদা সেক্টরে বিভক্ত।যার একটি রাশিয়া পরিচালনা করে থাকে এবং অন্যটি যুক্তরাষ্ট্র।সঙ্গত কারণেই এই দুই সেক্টরের পানি পুনরুৎপাদনের ব্যবস্থাও আলাদা। যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত ব্যবস্থায় তারা বাতাস থেকে ঘনীভূত বাষ্প, গোসলের পরিত্যক্ত পানি এবং তাদের মূত্র পরিশোধন করে পানির যোগান দেয়।এই প্রক্রিয়ায় তারা প্রতিদিন প্রায় ১৪ লিটার খাবার পানি উৎপাদন করতে পারে। অন্যদিকে রাশিয়ানরা কেবল ঘনীভূত বাষ্প আর গোসলে ব্যবহৃত পানি রিসেইকেল করে, কিন্তু মূত্র থেকে পানি সংগ্রহ করে না।এতে করে আমেরিকানেদের চেয়ে কিছুটা কম খাবার পানি পেয়ে থাকে তারা (মাঝেমধ্যে, যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাস্ট্রোনটরা আইএসএসএর রাশান অংশের ইউরিন সাপ্লাই নিয়ে এসে নিজেরাই পরিশোধন করে ব্যবহার করেন। এতে করে কোনো পানি আর নষ্ট হয় না!)

কিন্তু শুধু রিসাইকেল করাই যথেষ্ট নয়।এই পুনরুৎপাদিত পানিকে জীবাণুমুক্ত করা আবশ্যক।আইএসএসএর এই দুটি গ্রুপ তাদের পরিশোধিত পানি জীবাণুমুক্ত করার জন্যও আলাদা আলাদা উপায় অনুসরণ করে।১৯৮১ সাল থেকে নাসা পানি জীবাণুমুক্তকরণের উপাদান হিসেবে আয়োডিন এর ব্যবহার শুরু করে।এই পদ্ধতিতে জীবাণুমুক্ত পানিকে আবার ফিল্টার করে নিতে হয়।কারণ পানিতে অতিরিক্ত আয়োডিন রয়ে গেলে তা থাইরয়েডজনিত নানান সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। অন্যদিকে রাশানরা এই কাজের জন্য আয়োডিন এর পরিবর্তে সিলভার ব্যবহার করে আসছে।১৯৮৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক 'মির স্টেশন' লঞ্চ হওয়ার সময় থেকেই তারা পানি বিশুদ্ধকরণে সিলভারের ব্যবহার শুরু করে।

হিলিয়াম
জ্যোতিরসায়ন

ChemFusion
www.chemfusion.net

নাসা, স্পেসমিশন ও রসায়ন

২০২১ সালের পহেলা অক্টোবর নাসা (Nasa -National Aeronautics and Space Administration) তাদের ৬৩ বছর পূর্তি উৎযাপন করবে।দূরবর্তী গ্রহ-নক্ষত্রের থেকে শুরু করে উদ্ভাবনী প্রযুক্তি তৈরি করা পর্যন্ত,এবং মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের বর্তমান যে ধারণা রয়েছে, তাতে নাসার অবদান সবচেয়ে বেশি/অপরিসীম তবে জনপ্রিয় বিশ্বাসের বিপরীতে, তারা কেবল জ্যোতির্বিজ্ঞান কীংবা মহাকাশ গবেষণাতেই থেমে থাকেনি, নাসা রসায়নবিদ্যার জগতেও ব্যাপকভাবে অবদান রেখে চলেছে।

নাসার সাথে রসায়ন এর সম্পর্ক:

আমরা সকলেই জানি নাসার সবচেয়ে বিখ্যাত কীর্তি হলো একজন মানুষকে চাঁদে অবতরণ করানো; যা মানবজাতিকে পৌঁছে দিয়েছিল এক নতুন উচ্চতায়, তৈরি করেছিলো অজানাকে জানার এক অপার সম্ভাবনা।তবে নাসার এই মহাজাগতিক স্পেস শাটল এখানেই থেমে থাকেনি, তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে রসায়ন এর নানান ক্ষেত্রও উন্মোচিত হয়েছে।

নাসার রসায়ন সম্পর্কিত উদ্যোগগুলির মধ্যে জ্যোতি-রসায়ন (Astrochemistry- মহাকাশে অণু পরমাণুর অধ্যয়ন), বায়ুমণ্ডলীয় রসায়ন (Atmospheric Chemistry- পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের রসায়ন) এবং গ্রহ রসায়ন (Planetary Chemistry- গ্রহ ও তাদের পরিবেশ অধ্যয়ন) উল্লেখযোগ্য।রসায়ন দ্বারা জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব এমনকি স্বাস্থ্যসেবায়ও অবদান রাখা হয়।বিভিন্ন পদার্থের অনুসন্ধান ও নানাবিধ রাসায়নিক ঘটনার কারন উন্মোচন করা থেকে শুরু করে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন রসায়ন সম্পর্কিত প্রযুক্তি উদ্ভাবনেও নাসার ভুমিকা অতুলনীয়; যা কিনা রসায়ন এর বিভিন্ন তত্ত্ব পরীক্ষা ও তা বিকাশের দ্বার উন্মোচন করেছে।আসলে, রসায়ন এর বিভিন্ন গবেষণা ব্যাতিত নাসার অনেক অর্জনই অস্তিত্বহীন হয়ে যেত।

নাসার ইতিহাসে রসায়ন কীভাবে ভূমিকা রেখেছে?

১৯৫৮ সালে গঠনের পর থেকে এ পর্যন্ত নাসার ইতিহাসে বেশকিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা যুক্ত হয়েছে - যদিও তার সবই adds fluency সুখকর নয়।নাসার সাফল্যমণ্ডিত ইতিহাসেও বিফলতার কমতি নেই।রসায়নকে ধন্যবাদ যে এর মধ্যে বেশকিছু সমস্যার সমাধান রসায়ন দিতে পেরেছিলো।

১৯৮৬ সালে নাসার দ্বিতীয় মহাকাশ যান "চ্যালেঞ্জার" যাত্রা শুরু করার ঠিক ৭৩ সেকেন্ড পরে ইঞ্জিন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং এতে থাকা সাতজন ক্রু সহ বিস্ফোরিত হয় ।

NASA

বিস্ফোরণের কারণ অনুসন্ধানের জন্য নিয়োগকৃত প্যানেলের মধ্যে পদার্থবিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যানও ছিলেন।তিনি দেখান যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নাসার ইঞ্জিনিয়ারদের চোখ এড়িয়ে গিয়েছে।রকেট বুস্টারগুলো একসাথে সিল করতে ব্যবহৃত 'ও-রিং'গুলির রাবার 0°C এর কম তাপমাত্রায় প্রসারিত না হওয়ায় 'SRB' বা রকেট বুস্টারগুলোর মাঝে ফাঁক সৃষ্টি হয়েছিলো, যার মধ্যে দিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস বের হয়ে বিস্ফোরণের সূচনা করে।পুরো ঘটনাটি তিনি টেলিভিশনে একটি বিপর্যয় পরবর্তী সম্প্রচারে ছোট্ট পরীক্ষার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন।নিচের লিংকে ক্লিক করে ভিডিওটি দেখা যাবে:

https://youtu.be/6Rwcbsn19c0

আরেকটি উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত হলো নাসার ১৯৭০ সালের তৃতীয় চন্দ্রাভিযান ; সেই সময় অ্যাপোলো ১৩ মহাকাশযাটির একটি উন্মুক্ত তারের স্ফুলিঙ্গের কারণে অক্সিজেন ট্যাঙ্কটি বিস্ফোরিত হয়।ফলেএকটি সংকটময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এবং তাদের মিশনটি বাতিল করা হয়।বোর্ডে থাকা তিনজন নভোচারীকে লুনার মডিউল এর সাহায্যে পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। লুনার মডিউল সাধারণত দুইজন লোকের দুইদিন থাকার জন্য নির্মিত।কিন্তু তাদের তিনজনকে চারদিনের সফরে খাদ্য, জল এবং তাপের অপর্যাপ্ততা নিয়ে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করতে হয়।যার ফলে মহাকাশে তাদের ১৪২ ঘন্টায় ১৪ কেজির সম্মিলিত ওজন হ্রাস পেয়েছিল; যা ছিলো যেকোনো ক্রু এর জন্য রেকর্ড।ভাগ্যক্রমে, দিনটি বাঁচাতে সেখানে রসায়ন ছিল।

অ্যাপোলো ১৩ এর অভ্যন্তরীণ কারিগরি (এবং পরিবেশ) প্রক্রিয়া সমূহ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে ক্রুদের যে সমস্ত সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল সেগুলো পরাস্ত করা সম্ভব হত না।বিষাক্ত CO_2 অপসারণের জন্য লিথিয়াম হাইড্রোক্সাইড ক্যানিস্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র।

তিনজন ক্রু এর অতিরিক্ত কার্বনডাইঅক্সাইড অপসারনের জন্য একটি লিথিয়াম হাইড্রোক্সাইড ক্যানিস্টারের প্রয়োজন ছিলো; যা তারা অতিরিক্ত যন্ত্রাংশের সাহায্যে তৈরি করেছিলেন।ব্যাটারি থেকে অবশিষ্ট শক্তি কমান্ড মডিউলটি পুনরায় চালু করতে এবং ক্রুদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতেও ব্যবহৃত হয়েছিল।মহাকাশচারীদেরকে লুনার মডিউল (যা সাধারণত চন্দ্র সেগুলো উপরে থাকে) এর ইঞ্জিনটিও যান্ত্রিকভাবে চালনা করতে হয়েছিল যাতে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রবেশের জন্য সঠিক পথ ধরে রাখা যায়।

মিশনটিকে ‘NASA’s Best Hour’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়এবংপরবর্তীতে এই ঘটনাটি চলচ্চিত্র, টিভি সিরিজ/শো **makes better sense than** পর্ব এবং এমনকি একটি থিয়েটার প্রযোজনায় ও অনুপ্রাণিত করেছে।ঘটনার আলোকে, নাসা তাদের মহাকাশযানের নকশায় বেশ কিছু পরিবর্তন আনে, এবং যাতে এমন ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য তারা অতিরিক্ত অক্সিজেন ট্যাঙ্ক এবং জল সংরক্ষক ব্যাগ যুক্ত করে।

রসায়নবিদরা কি কখনোও মহাকাশচারী হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলো?

হ্যাঁ; আসলে কয়েক বছর ধরে অনেক রসায়নবিদ মহাকাশচারী হয়েছেন।জন লেওলিনই প্রথম নাসা নভোচারী হিসাবে নির্বাচিত রসায়নবিদ ছিলেন, কিন্তু পরে তিনি বিমান চালনার কোর্সটি শেষ করতে না পেরে পদত্যাগ করেছিলেন।রসায়নবিদ হেলেন শারম্যান ছিলেন প্রথম ব্রিটিশ নভোচারী যিনি রাশিয়ার মীর মহাকাশ স্টেশন গিয়েছিলেন।পলিমার সায়েন্সে পিএইচডি ডিগ্রিধারী ক্যাডি কলম্যান আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন (আইএসএস) -এ ১৫৯ দিন অতিবাহিত করেছিলেন।

রসায়ন স্নাতক লিল্যান্ড মারভিন এর মহাকাশচারী হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা না থাকলেও কেবল উৎসাহের বসে নাসার নভোচারী প্রোগ্রামে দুইবার আবেদন করেন।এর পর থেকে তিনি আইএসএসের দুটি মিশনে ছিলেন।

অন্যান্য রসায়নবিদ নভোচারীদের মধ্যে আছেন ভৌত রসায়নবিদ ট্রেসি কলডওয়েল ডাইসন যিনি মহাকাশ শাটলEndeavour-এ করে তিনবার মহাকাশ ভ্রমণ সম্পন্ন করেছেন।মহাকাশে প্রথম মা হওয়া আনা লি ফিশার ও ছিলেন একজন রসায়নবিদ ।

নাসা থেকে কোন রাসায়নিক উদ্ভাবন এসেছে কি?

নাসা বিজ্ঞানীরা প্রচুর দরকারী please change করেছেন; What? এবং পটাসিয়াম সিলিকেট দ্বারা ক্ষয়রোধী আবরণ তৈরি করেন যা স্পেস সেন্টার এর সরঞ্জামগুলিকে মরিচা প্রতিরোধীকরেছে।এই একই টেকনোলজি স্ট্যাচু অফ লিবার্টিতেও ব্যাবহৃত হয়েছিল ।এই প্রযুক্তির কারণে, মহাশুন্যে উন্মুক্ত লোহা যা কিনা ট্রাইক্লোরোইথিলিন(trike) এর মত বিষাক্ত রাসায়নিক তৈরিতে সক্ষম ছিলো তা দূর করা সম্ভব হয়েছে।

নাসার বেশ কিছু উদ্ভাবন আপনি বাড়িতেও পেতে পারেন।মেমরি ফোম, যা গদিগুলিকে আরামদায়ক করার জন্য ব্যবহার করা হয় , সেটি মূলত নাসা উদ্ভাবন করে কর্য্যাশ এর সময় চালক এবং যাত্রীদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য।নাসাকে ধন্যবাদ আঁচড় প্রতিরোধী (scratch-resistant) ও অতিবেগুনী রশ্মি প্রতিরোধী চশমাগুলির জন্য যা চোখের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।এই চশমায় রঞ্জক এবং জিংক অক্সাইড ব্যবহার করা হয়।

নাসার রসায়নবিদরা কী কাজ করেন?

নাসা রসায়নবিদরা সুপার গ্লু, পলিমার প্লাস্টিক এবং প্রোপেলেন্টের মতো রাসায়নিক পদার্থের আবিষ্কারক। ফিউশন এবং ফিশনের মতো প্রক্রিয়াগুলির পর্যবেক্ষক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় বস্তুগুলির রচনাকারি।মহাবিশ্বের রাসায়নিক উৎস বের করার মত যুগান্তকারী আবিষ্কারও তাঁরা করেন।মহাকাশ মিশনের পরামর্শ ও জলবায়ু পরিবর্তনের মতো পৃথিবীর মূল ইভেন্টগুলির পর্যবেক্ষণের দায়িত্বওরসায়নবিদদের হাতে ন্যাস্ত ।নাসায় রাসায়নিক ইঞ্জিনিয়াররা চাঁদ ও মঙ্গল গ্রহের উপরিভাগ এবং বায়ুমণ্ডল প্রক্রিয়াকরণের জন্য যেকোনও মহাকাশযান এর প্রোটোটাইপ নির্মাণের প্রয়োজনীয় তাপ নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি বিকাশ করেন।এরকম আরো অনেক কাজ আছে যা নাসার সাথে রসায়ন এর গভীর যোগসূত্র স্থাপন করে।

ছিলিয়াম
জ্যোতিরসায়ন

ChemFusion
www.chemfusion.net

নভোচোরীর কলমে রসায়ন

যেখানে গ্রাভিটি থাকবে না সেখানে কি লেখালেখি সম্ভব? প্রশ্ন জেগেছিল নভোচারী পেড্রো ডুকুর মনে ১৯৯২ সাল থেকে তিনি বিভিন্ন স্পেস প্রোগ্রামের সাথে যুক্ত ছিলেন।স্পানিশ এই নভোচারী তাই মিথটার সত্যতা যাচাই করতে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে একটি কলম নিয়ে যাবেন বলে ঠিক করলেন।ইসার এই নভোচারী ২০০৩ সালের ১৮ই অক্টোবর মহাকাশ স্টেশনে নিয়ে গেলেন সস্তা একটা বলপেন।অনেকের মতে পেড্রোরও ধারণা ছিল মহাকাশে বলপেন দিয়ে লেখা অসম্ভব একটি কাজ।কিন্তু মহাকাশেও বলপেনকে ঠিকভাবে কাজ করতে দেখে তিনি নিজেই অবাক হয়ে গেলেন।বলপেন দিয়ে আসলে ওজনশূন্য পরিবেশেওকাজ চালানো যেতে পারে।বলপেন এমনভাবে তৈরি যে অভিকর্ষের প্রভাবে কালি নিচের দিকে নামলে তা দিয়ে লেখা যায়। কলমটি তখনই কাজ করা বন্ধ করে দেবে যখন অভিকর্ষ কলমের কালিকে ভুল/উলটো দিকে টেনে নিয়ে যাবে।

পেড্রো এই এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে বিস্তারিত লিখেছিলেন "পেড্রোডকু'স ডায়েরি ফ্রম স্পেস" শীর্ষক প্রবন্ধে।

তাহলে এই সমস্যার সমাধান কিভাবে হতে পারে? খুব সহজেই মনে হচ্ছে কলম দিয়ে লেখা না গেলে পেন্সিল দিয়ে লিখবে।হ্যাঁ, মহাকাশ যাত্রার প্রথম দিক রাশিয়ান এবং আমেরিকান দুই জাতিই মহাকাশে গিয়ে পেন্সিল ব্যবহার করতো।দুর্ভাগ্যজনকভাবে, পেন্সিলের নিব গ্রাফাইট দিয়ে তৈরি এবং যেটা তাপ ও বিদ্যুতের অত্যন্ত ভালো মানের পরিবাহক।অভিকর্ষহীন মহাকাশে ভেঙে যাওয়া নিব/গ্রাফাইট এর টুকরো অনেক/বিভিন্ন সমস্যার জন্ম দিতে পারে। যেমন- বাতাসের ভেন্টিলেশন সিস্টেমে বা ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতির মধ্যে ঢুকে গিয়ে শর্ট সার্কিট হতে পারে। ক্যাপশুলের বিশুদ্ধ অক্সিজেনযুক্ত পরিবেশে আগুন ধরে যেতে পারে।আর পেন্সিল কাটার সময় তার বর্জ্য বের হয়ে মহাকাশচারীদের চোখেমুখে প্রবেশ করতে পারে।পেন্সিলের কাঠ দাহ্য পদার্থ হওয়ায় অগ্নিসংযোগের সম্ভাবনা থাকে। এসব কারণে তাই সেখানে বিশেষ স্পেস পেন ব্যবহার হয়ে থাকে।

প্রথম দিকে নাসা যখন মহাকাশযান পাঠানো আরম্ভ করলো তখন বুঝলো যে, বলপয়েন্ট কলম অভিকর্ষ ছাড়া কাজ করবে না।তখন মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা হল এমন এক কলম বানানোর জন্য যেকোনো পৃষ্ঠে, যে কোন কোণে, শূন্যের নিচ থেকে শুরু করে ৩০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পর্যন্ত কাজ যেটি।কিন্তুখরচ অনেক বেড়ে যাওয়ার ফলে প্রকল্পটি বাতিল হয়ে যায় এবং নভোচারীরা সোভিয়েতদের সাথে সাথে পেন্সিল ব্যবহার করতে ফিরে যান।

পরবর্তীতে সকল সমস্যার সমাধান হলো পল ফিসারের স্পেস পেন বা এন্টি গ্রাভিটি পেনের মাধ্যমে।'ফিসার স্পেস পেন' কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা পল ফিসার ১৯৬৫ সালে স্পেস পেন আবিষ্কার করেন এবং ১৯৬৬ সালে এটাকে পেটেন্ট করান।পল ফিসার থিক্সোট্রপ নামে বিশেষ কালি আবিষ্কার করেছিলেন।যেখানে সাধারণ কলমগুলোতে কালির প্রবাহের জন্য গ্রাভিটি ব্যবহার করা হয়, সেখানে ফিসার স্পেস পেনে সংকীর্ণ(?) নাইট্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করে চাপ প্রয়োগ করা হয় কালিকে কলমের অগ্রভাগ থেকে বের করার জন্য।স্পেস পেনে ব্যবহৃত চাপযুক্ত কালি কার্তুজ স্পেস পেনকে মহাকাশে লেখার জন্য আদর্শ হিসেবে তৈরি করে।যেটি ব্যবহার করে শূন্য মধ্যাকর্ষণ, জলের তলে, ভেজা এবং চিটচিটে কাগজের উপর, যে কোন কোণে এবং অনেক চরম তাপমাত্রায় লিখতে সক্ষম।বলপয়েন্টটি টাংস্টেন কার্বাইড থেকে তৈরি এবং ফুটোটি এড়াতে সঠিকভাবে ফিট করা হয়।অপারেটিং তাপমাত্রা -৩০ থেকে ২৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত হয়।কলমের জীবনকাল আনুমানিক ১০০ বছর।

ChemFusion
www.chemfusion.net

তবে নাসা স্পেস পেনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে দাবিটি ভুল, কারণ ফিসার পেনটি বেসরকারি মূলধন ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছিল, যা সরকারের অর্থায়নে নয়।থিক্সোট্রপিক কালি তৈরির জন্য ফিসারকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে হয়েছিল ।পরবর্তীতে নাসা প্রতিটি মহাকাশের কলম কিনে নিল মাত্র ২ ডলার ৯৫ সেন্ট দিয়ে।কলমটি পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহারের জন্যজন্য নাসা কখনো পল ফিসারের কাছে যায়নি, বরং ১৯৬৫ সালে ফিসার নাসাকে এটি চেষ্টা করতে বলেন। ব্যাপক পরীক্ষার পরে, নাসা ভবিষ্যতে অ্যাপোলো মিশনে কলমগুলি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ।পরবর্তীতে জানা যায় ১৯৬৭ সালে নাসা প্রায় ৪০০ পিস কলম ক্রয় করেছিল তাদের ভবিষ্যৎ মিশনের জন্য।শীঘ্রই সোভিয়েতরা পেন্সিল ব্যবহারের পরিবর্তে নাসার মত ফিসারের পেন ক্রয় করা শুরু করেছিল।

জ্যোতিরসায়নবিদ

আপনি যদি কাউকে বলেন আপনি রসায়নের শিক্ষার্থী তাহলে প্রথম যে প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন সেটি হলো "জীবনে কী করবা এই পিউর সাবজেক্ট পড়ে?" দুঃখজনকভাবে আমাদের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটেই হোক বা সামাজিক,শিক্ষার মূল লক্ষ্য যেটি,অর্থাৎ শেখাটাকে মোটাদাগে মুখ্য হিসেবে ধরা হয় না।আনন্দের সাথে শেখার সাথে খুব কম জনেরই পরিচয় হওয়ার সৌভাগ্য হয় এখানে।কেউ তো বলেই ফেলে, "চাকরি তো নেই,খাবে কী?" এটা ঠিক যে তত্ত্ব বা জ্ঞান সবসময় অন্ন জোগায় না,তবে একইসাথে শিক্ষার উদ্দেশ্য যে মনের পিপাসা মেটানো সেটা থেকেও আমরা যোজন যোজন দূরেই আছি।

তাহলে রসায়ন শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ কী? কী ই সম্ভাবনা এই দিগন্তের? ঠিক এই প্রশ্নগুলোর জবাব খুঁজতেই আমাদের যাত্রা।গতানুগতিক চাকরি বা বিসিএস ই কি রসায়ন এ ক্যারিয়ারের একমাত্র পথ?নাকি রসায়নেও আছে অবিশ্বাস্য কিছু করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়ার সুযোগ? আসুন আজ পরিচিত হই নতুন কিছুর সাথে।

Astrochemistry: কিছুদিন আগে আমাদেরই একজন ড. জাহিদ প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে করে ফেলেছেন ভাইল ফার্মিয়ন কণার আবিষ্কার।আর এই আবিষ্কার এর সাথে কেবল ফিজিক্স ই নয় জড়িয়ে আছে কেমিস্ট্রি ও ভূপৃষ্ঠ,ভূগহ্বর হতে মহাশূন্য সর্বত্রই বিরাজ করছে রসায়ন।Astrochemistry এর বিষয়বস্তু হলো মহাবিশ্বে বিদ্যমান অণুসমূহের প্রাচুর্য ও পারস্পরিক বিক্রিয়া, রূপান্তর প্রভৃতি বিশ্লেষণ করা।সূর্যের মধ্যে প্রতিনিয়ত হওয়া ফিউশন বিক্রিয়া বা গর‍্যাভিটন এর আবিষ্কার সবই এই শাস্ত্রের অবদান।

কোয়ার্ক,মেসন,গুয়ন বা ডার্ক ম্যাটার ইত্যাদির সাথেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই শাস্ত্র।কেবল মৌল বা পদার্থের গঠন নয়,বিবর্তন ও এই শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

আমরা সবাই জানি ভবিষ্যৎ দুনিয়ার ক্ষমতা বিস্তার এখন মহাকাশে।মঙ্গলে পানি আছে কি না,চাঁদের মাটিতে বিশেষ কি আছে এইসব নিয়েই এখন গবেষণা।স্পেসস্যুট এর গঠন থেকে শুরু করে ভিনগ্রহের স্যাম্পল সবকিছু বিশ্লেষণ এখন কেমিস্ট দের হাতেই।

জব সেক্টরঃ কেবল নাসা ই নয় বর্তমানে সকল টপ ইউনিভার্সিটিতে এই বিষয়ে পড়ানো ও গবেষণার জন্য প্রচুর শিক্ষক,গবেষক দায়িত্বপ্রাপ্ত হচ্ছেন।ইউরোপীয় ইউনিয়ন স্পেস এজেন্সি, রাশিয়ান স্পেস এজেন্সি থেকে শুরু করে ভারতেও এরকম অনেক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত বাড়ছে শিক্ষক, গবেষক হিসেবে কাজের জন্য এটি ভবিষ্যতে গোল্ড মাইন হয়ে উঠবে তা বলাই বাহুল্য।

স্যালারিঃ জবের কথা উঠলেই আগে পকেটের চিন্তা করতেই হয়।এক্ষেত্রেও হতাশ হবার কিছু নেই।salary expert website এর মতে একজন এস্ট্রোকেমিস্ট এর বার্ষিক গড় বেতন বছরে $৭৬৬৫০ যা বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ৬০ লক্ষের মতো।mymajors এর মতে এটি $৯৪৮৪০ যা প্রায় ৭৮ লক্ষের মতো।সুতরাং পকেট গরম থাকা নিশ্চিত।

ছিলিয়াম
জ্যোতিরসায়ন

ChemFusion
www.chemfusion.net

সমস্যাঃ সীমিত সুযোগের জন্য সর্বোচ্চ মেধাবীদের লড়াই হওয়ায় এ সেক্টরে প্রতিযোগিতা প্রচুর ২০১৭ সালে নাসায় ১২ টি পদের বিপরীতে আবেদন পড়েছিলো ১৮৩০০ টি।এক্সপার্ট না হলে এ সেক্টরে টিকে থাকা মুশকিল।

সম্ভাবনাঃ প্রতিনিয়ত এ সেক্টরে গবেষণার সুযোগ ও বরাদ্দ বেড়েই চলেছে উন্নত বিশ্বের নজর এখন মহাকাশে প্রভাব বিস্তার ও নানাবিধ সম্ভাবনা নিয়ে।সেজন্য এক্সপার্টদের সুযোগ ও বেড়ে চলছে।

করণীয়ঃ রসায়ন বা পদার্থবিজ্ঞান মেজরের যে কেউ উচ্চশিক্ষায় এস্ট্রোকেমিস্ট্রি নিয়ে পড়াশোনা ও গবেষণা করে দক্ষতা অর্জন করে এই সেক্টরে সাফল্য লাভ করতে পারেন।

আমাদের দেশ থেকে নাসা,গুগল,মাইক্রোসফট, ইন্টেল এ প্রচুর ইঞ্জিনিয়াররা জব করছেন কিন্তু থিওরিটিক্যাল বিষয়ে পড়াশোনা করেও এরকম জায়গায় যাওয়া সম্ভব এবং আমাদের পাশের দেশ থেকেই শত শত শিক্ষার্থী এই সেক্টরগুলো দখল করছে এবার সুযোগ নেয়ার সময় টা আমাদের সময়ের সাহসী সেই তারুণ্যকে শুভকামনা।

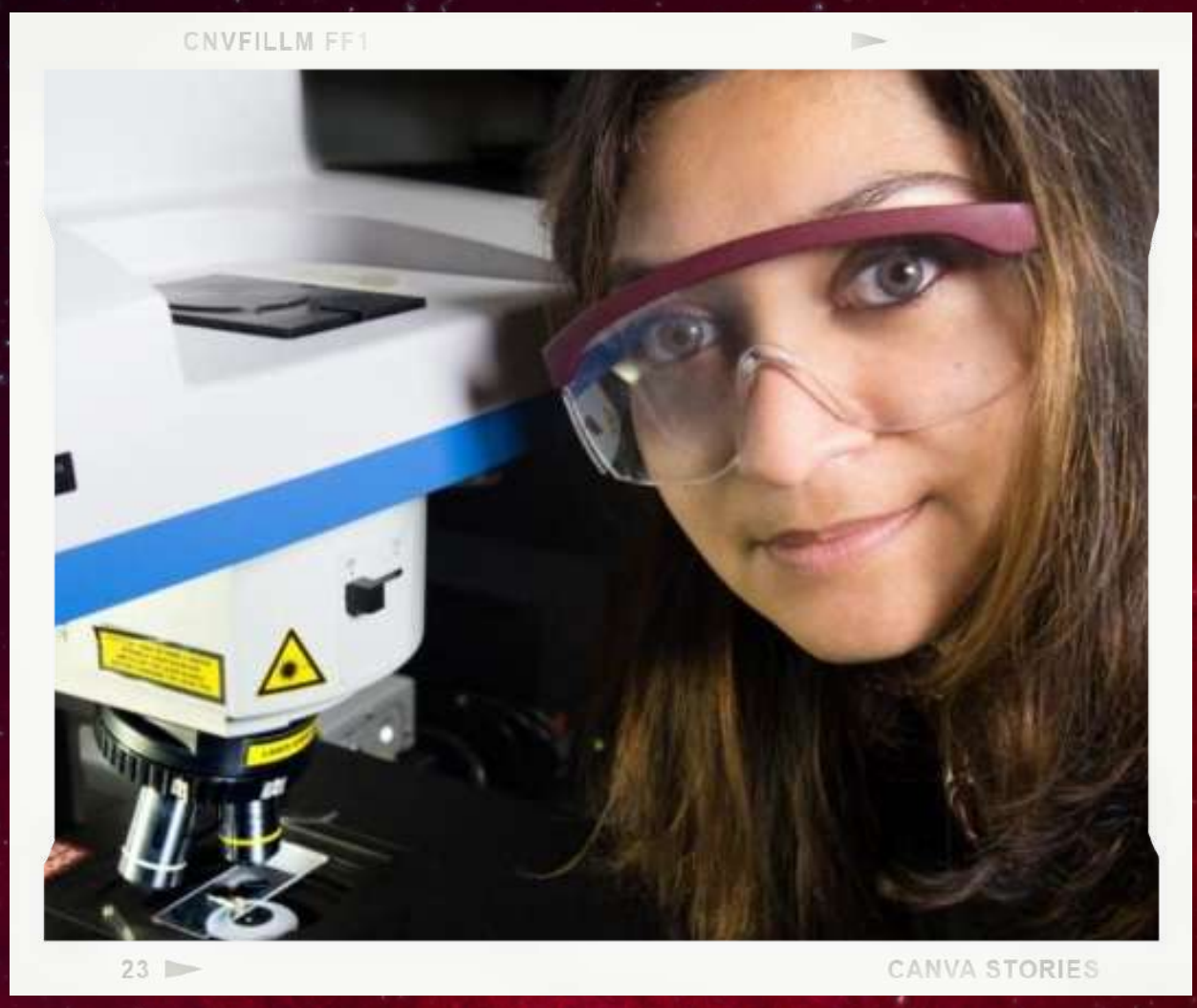

২০১৭ সালে নাসার সেরা উদ্ভাবন পুরষ্কার লাভ করেন নাসাতে কর্মরত বাংলাদেশী বিজ্ঞানী মাহমুদা সুলতানা।

মহাকাশে সহজে ব্যবহার করা যাবে, এমন ছোট ও যুগান্তকারী প্রযুক্তির যন্ত্র আবিষ্কারের জন্যই এ পুরষ্কার দেওয়া হয়েছিল।

নাসার সাময়িকী "Cutting Edge" এ তৎকালীন সংখ্যায় তাকে নিয়ে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন করা হয়েছিলো। প্রতিবেদনে মাহমুদাকে নিয়ে নাসার বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের নানা উচ্ছাস প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল।

মূলত ন্যানো টেকনোলজি, 3D প্রিন্টিং, ডিটেক্টর ডেভেলপমেন্ট এসব নিয়েই মাহমুদার গবেষণা।MIT-এর সাথে মিলে কোয়ান্টাম ডট প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন আলো তরঙ্গ ডিটেক্টর নিয়ে গবেষণা করেছেন তিনি।থ্রিডি প্রিন্টার আরো সহজ করার জন্যও তার আবিষ্কার ‘গ্রাউন্ড ব্রেকিং’ বলে বিবেচিত হচ্ছে।

২০১০ সালে MIT থেকে কেমিকেল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পিএইচডি নেবার আগেই এক জব ফেয়ারে তিনি নাসায় কাজের সুযোগ পান।এর আগে তিনি ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া থেকে কেমিকেল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আন্ডার গর‍্যাজুয়েট করে কাজ করেছিলেন বিখ্যাত বেল ল্যাবরটরিতে রিসার্চ এসিস্ট্যান্ট হিসেবে।

এন্টার্কটিকায় ওজোন গর্ত

বিজ্ঞান বিষয়ে জানার আগ্রহ রয়েছে কিন্তু ওজোন গ্যাস এর কথা শোনেননি, এমন মানুষ কমই মিলবে।পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে একটি স্তর ওজোন গ্যাসের তৈরি যাকে বলা হয় ওজোন স্তর।আজ বলবো ওজোন গর্ত সম্পর্কে, যা নিয়ে এক সময়ে বিজ্ঞানীরা উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং এর রেশ বর্তমানে বিদ্যমান।চলুন প্রথমে ওজোন গ্যাস এর সাথে পরিচিত হওয়া যাক।

ওজোন (O3) অক্সিজেনের তৈরি অণু, যা ক্ষতিকর অতিবেগুনি আলোর নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে শোষণ করে।ভূপৃষ্ঠ হতে 15-50 কিলোমিটার গড় উচ্চতায় বায়ুমণ্ডলের স্তরটিকে বলা হয় স্ট্রাটোস্ফিয়ার।প্রায় 35 কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত স্ট্রাটোস্ফিয়ারের 20-30 কিলোমিটার অংশে ওজন গ্যাস যুক্ত একটি বায়ুস্তর রয়েছে।এই স্তরটি ওজোন স্তর বা ওজোন মণ্ডল নামে পরিচিত।ওজোন গ্যাস খুবই হালকা এবং অস্থিতিশীল।যার ফলে সৃষ্ট ওজোন স্তরও ক্রমাগত ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে যায়।1913 সালে ফরাসি বিজ্ঞানী ফ্যাব্রি ও বুশন সর্বপ্রথম বায়ুমণ্ডলে ওজোন স্তরের উপস্থিতি প্রমাণ করেন।

বিংশ শতকের শুরুতে ওজোন স্তর আবিষ্কৃত হলেও, ওজোন গর্ত সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় আশির দশকে।ভূপৃষ্ঠ ও আকাশ থেকে বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে ওজোন স্তর নিরীক্ষণ করা হতো।তবে এসব যন্ত্রপাতি বিভিন্ন কারণে নিখুঁত ভাবে কাজ করতে পারছিল না।যার ফলে ওজোন স্তরের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিবর্তন রেকর্ড করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।1983 সালের দিকে এই সমস্যার একটি সমাধান পাওয়া যায়।তবে কম্পিউটারের ধীরগতির এবং ডাটা পরিবহনের জন্য ডিজিটাল লিংক এর অভাবে ডাটা প্রসেসিং নয় মাস পিছিয়ে পড়েছিল, এর ফলে অক্টোবর 1983 সালের পাওয়া তথ্য অনুযায়ী যন্ত্রপাতি রিক্যালিব্রেট করতে জুন 1984 সাল পর্যন্ত সময় লেগেছিল।

1985 সালের মে মাসে ভূতত্ত্ববিদ ফার্মান, ব্রিটিশদের দ্বারা পরিচালিত অ্যান্টার্কটিকার হ্যালি বে স্টেশন থেকে ওজোন গর্ত পর্যবেক্ষণ করে রিপোর্ট করেন, যা সেসময়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।
1985 সালের আগস্টে টমস স্যাটেলাইট ইন্সট্রুমেন্ট দ্বারা অ্যান্টার্কটিকায় ওজোন গর্তের প্রথম চিত্র এবং এসবিইউভি ইন্সট্রুমেন্ট দ্বারা মৌসুমী চক্রে মোট উৎপাদিত ওজোনের পরিমাণ দেখানো হয়েছিল।যেটা ভূতত্ত্ববিদ ফার্মান এর তথ্যের সত্যতা প্রমাণ করে।ভূতত্ত্ববিদ ক্যালিস ও নাটারজান পুনরায় বিষয়টি বর্ণনা করেন এবং বর্ণনাকৃত ফলাফল পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়।

অতঃপর নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রফেসর ডক্টর রোনাল্ড হিথ ওজোন গর্তের চিত্র সংগ্রহ করে নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশ করেন।এই চিত্রগুলি সর্বপ্রথম আবিষ্কার হওয়ার প্রায় তিন দশক পরেও মিডিয়া এবং জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল।

ওজোন, ওজোন স্তর এবং ওজোন গর্তের আবিষ্কার এবং চিত্র সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার পর বাকি থাকলো "ওজোন গর্ত" সৃষ্টি রহস্য।চলুন সে সম্পর্কেও জেনে নেয়া যাক।

ক্লোরোফ্লোরো কার্বনকে সংক্ষেপে সিএফসি বলা হয়।এই সিএফসি গ্যাস ওজোন গর্তের সৃষ্টি করে।হেয়ার স্প্রে থেকে শুরু করে রেফ্রিজারেটর এবং এয়ারকন্ডিশনিং যন্ত্রগুলোতে এসব গ্যাস পাওয়া যায়।সিএফসির ক্ষতিকর প্রভাব লক্ষ্য করে বিজ্ঞানীরা ভাবতে শুরু করেন সিএফসি এর পরিবর্তে হাইড্রোফ্লোরোকার্বন (এইচএফসি) এবং হাইড্রোব্রোমোফ্লোরোকার্বন (এইচবিএফসি) এর ব্যবহার বাড়ানোর কথা।পরবর্তীতে দেখা গিয়েছিল, এইচএফসি কার্বন-ডাই-অক্সাইড থেকে কয়েক গুণ এবং এইচবিএফসিতে ক্লোরিন থেকে ব্রোমিন শতগুণ বেশি বিক্রিয়া করে।এছাড়াও সালফিউরিক অ্যাসিড, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, এইচএফসি ওজোন স্তরের জন্য ক্ষতিকর।

সে সময়ে ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা বলেন, এর পিছনে সম্ভাব্য কারণ সিএফসি গ্যাস, যা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়েছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মতো অ্যান্টার্কটিকার উপরে ক্লোরিন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ পরিমাপ করে দেখা যায় যে, অন্যান্য স্থানের তুলনায় সেখানের ক্লোরিন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অনেক বেশি।এই কারণে ওজোন স্তর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল।

এবার স্বাভাবিকভাবে কৌতূহল জাগতেই পারে, মানববহুল অঞ্চলে সিএফসি এর উৎপাদন হলেও, বরফে আচ্ছাদিত অ্যান্টার্কটিকা, যেখানে জনবসতি নেই, সেখানে ওজোন গর্ত কিভাবে সৃষ্টি হতে পারে? চলুন সে সম্পর্কে জেনে নিই!

পোলার ভর্টেক্স বা মেরুঘূর্ণি উচ্চস্তরের নিম্নচাপ অঞ্চল।এটি দক্ষিণ মেরুতে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরে এবং এই ঘূর্ণন কোরিওলিস (coriolis) পদ্ধতিতে হয়ে থাকে।পোলার ভর্টেক্স ঠাণ্ডা বায়ু বহন করে।প্রথমত প্রাকৃতিকভাবে অ্যান্টার্কটিকার তাপমাত্রা হ্রাস পেয়ে শূন্য ডিগ্রীর নিচে চলে আসে, দ্বিতীয়ত পোলার ভর্টেক্স এর কারণে পোলার স্ট্যাটোস্ফেরিক ক্লাউডস (পিএসসি) তৈরি হয়।এই পিএসসি ক্লোরিনের ফ্রী রেডিকেল তৈরি করে।অ্যান্টার্কটিকাতে সূর্যালোকের সাথে ওজোন গ্যাস বিক্রিয়া করার ফলে ওজোন গ্যাস হ্রাস পেতে থাকে এবং ক্লোরিন ও ব্রোমিন এর ফ্রী রেডিকেল ওজোনকে ভাঙতে শুরু করে।পৃথিবীর অক্ষাংশ থেকে বায়ু এসে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মতো প্রাকৃতিক উপায়ে ওজন স্তর পুনরায় মেরামত করার চেষ্টা করলেও সূর্যালোক ও ক্ষতিকর সিএফসি দ্বারা অতিরিক্ত ক্ষয়ের কারনে পুরোপুরি ক্ষতিপূরণ সম্ভব হয়ে ওঠে না।আর এভাবে ক্রমশ ওজোন স্তর ক্ষয়ের পরিমাণ বাড়তে থাকে।

পৃথিবীর পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু অধিক গুরুত্বপূর্ণ।ওজোন গর্তের ভয়াবহতা বিবেচনা করে 1987 সালে মন্ট্রিয়াল প্রটোকলে, সিএফসি গ্যাস নিয়ন্ত্রণে সমঝোতা করা হয়।এরপর থেকে পরিস্থিতির উন্নতি হতে শুরু করে।বর্তমানেও বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে ক্লোরিন ফ্রি র‍্যাডিকাল রয়ে গেছে, যার আয়ু 50-100 বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে।ধারণা করা হচ্ছে, 2050-60 সালের মধ্যে ওজোন স্তর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে এবং পৃথিবীতে প্রাণীকুল স্বস্তির শ্বাস নেবে।

একটি সৌরজগৎ-বহির্ভূত অণু

মহাকাশে নোবেল গ্যাসের অণু গঠন? হ্যাঁ, ঠিকই পড়েছেন!

আর্গোনিয়াম হল প্রথম সৌরজগত-বহির্ভূত অণু যা আর্গন এবং প্রোটনের সংমিশ্রণে গঠিত।

বিশেষ অবস্থা ছাড়া, নোবেল গ্যাসগুলি সাধারণত অত্যন্ত নিষ্ক্রিয়অবস্থায় থাকে।বেশিরভাগ মৌল/মৌলিক পদার্থ অণু গঠনের জন্য বাদ অন্যান্য মৌলেরসাথে ইলেক্ট্রন আদান-প্রদান করে, তবেনোবল গ্যাসগুলি তা করে না।যেহেতু নোবেল গ্যাসের পরমাণুর সবচেয়ে বাইরের শেল/ যোজ্যতা শক্তিস্তর ইলেক্ট্রন দ্বারা পূর্ণ, এটি সাধারণত অন্যান্য পরমাণুর সাথে ইলেক্ট্রন বিনিময় করে বন্ধন গঠন করে না এবং অণু তৈরি করে না - অন্ততপক্ষে পৃথিবীতে নয়।প্রাকৃতিকভাবে কোনও নোবেল গ্যাসের অণু পৃথিবীতে দেখা যায় নি।অন্যদিকে, মহাকাশে নোবেল গ্যাসগুলি সর্বব্যাপী হওয়ায়, নোবেল গ্যাসের অণুগুলির সন্ধানের জন্য মহাকাশ হচ্ছে সর্বোত্তম স্থান।মহাকাশে উচ্চ তাপমাত্রা এবং সাধারণ ঘনত্বে নোবল গ্যাসগুলিএমন আচরণ প্রদর্শন করে যা তারা পৃথিবীতে কখনও প্রদর্শন করবে না।যার মধ্যে তাদের অণু গঠন করা একটি।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ক্র্যাব নেবুলার অণুগুলিতে আর্গোনিয়াম শনাক্ত করেন এবং এটাই ছিল সর্বপ্রথম পর্যবেক্ষণ করা প্রাকৃতিকভাবে গঠিত নোবেল গ্যাসের অণু।বৃষ নক্ষত্রমন্ডলে (Taurus constellation) অবস্থিত ক্র্যাব নেবুলা একটি বিশাল নক্ষত্রের বিস্ফোরণের অবশিষ্টাংশ, যা ১০৫৪ সালে পৃথিবীর আকাশকে আলোকিত করেছিল।

হার্শেল স্পেস অবজারভেটরি ২০০৯ সালে মহাকাশে যাত্রা করে সম্ভবত অমিট করা যায় এটি হার্শেলকে দূরবর্তী বস্তু থেকে অবলোহিত (ইনফ্রারেড) তরঙ্গদৈর্ঘ্য পর্যবেক্ষণ করতে সুযোগ করে দেয়,ফ্লাইয়ের নিজস্ব উষ্ণতা এইসব পর্যবেক্ষণ কাজে বাধা দিতে পারে না কারণ শীতক হিসেবে তরল হিলিয়াম ব্যবহার করা হয়।দূরবর্তী অবলোহিত বর্ণালি নতুন মহাকাশীয় অণুর সন্ধানের জন্য জনপ্রিয় ক্ষেত্র/মাধ্যম, কারণ কিছু নির্দিষ্ট অণু দূরবর্তী-অবলোহিত তরঙ্গদৈর্ঘ্য শোষণ এবং বিকিরণ করে।হার্শেলের যাত্রা শুরুর এক বছরের মধ্যেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন যে, সৌরজগৎ-বহির্ভূত মহাকাশের কিছু জায়গা ৪৮৫ মাইক্রন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দূরবর্তী-অবলোহিত আলো শোষণ করে, যার সাথে আগের কোনো শোষণ বর্ণালীর মিল পাওয়া যায় না।বার্লো এবং তার সহযোগীরা নেবুলার আর্গন সমৃদ্ধ গ্যাসে দুটি নতুন বর্ণালীরেখা আবিষ্কার করেছিলেন।প্রথমটি হল একই রহস্যময় রেখা যা প্রথমে ৪৮৫ মাইক্রন তরঙ্গ দৈর্ঘে পাওয়া গিয়েছিল; দ্বিতীয়টি ছিল সেই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অর্ধেক - যা দুটি পরমাণুর একটি অণুর বৈশিষ্ট্য বহন করে।বার্লো নতুন এই অণুকে আর্গোনিয়াম হিসাবে নামকরণ করেছিলেন এবং ২০১৩ সালে তাঁর গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেন।এটিই ছিল প্রকৃতিতে পাওয়া প্রথম নোবেল গ্যাসের অণু।

আর্গোনিয়াম অণু দুটি পর্যায়ে গঠিত হয়।একটি মহাজাগতিক রশ্মি অথবা একটি উচ্চ গতির চার্জযুক্ত কণা প্রথমে আর্গন অণু থেকে একটি ইলেকট্রন বের করে নেয় এবং আর্গন আয়ন (Ar+) তৈরি করে।আর্গন আয়ন হাইড্রোজেন অণু (H2) থেকে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু নিয়ে আর্গোনিয়াম (ArH+) উৎপন্ন করে, কারণ হাইড্রোজেন পরমাণু অণুস্থিত অন্য হাইড্রোজেন এর থেকে আর্গন আয়নের দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়।তবে, আর্গোনিয়াম একটি ভঙ্গুর উপাদান ।এটি গঠনের জন্য যে হাইড্রোজেন অণুর প্রয়োজন, সেটিই এটিকে ধ্বংস করতে পারে।সুতরাং, আর্গোনিয়াম তখনই গঠিত হবে যখন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ হাইড্রোজেন অণু একত্রিত হবে, যার পরিমাণ এর থেকে বেশি বা কম হলে আর্গোনিয়াম গঠিত হবে না।

আমাদের মিল্কিওয়ের অংশে, সৌরজগৎ-বহির্ভূত গ্যাস দুটি ভাগে বিভক্ত: পারমাণবিক এবং আণবিক।প্রথম এবং সবচেয়ে সাধারণ ফর্মটি পৃথক হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম পরমাণু দ্বারা গঠিত।পারমাণবিক গ্যাস যেহেতু বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে, তাই তাদের দ্বারা নতুন নক্ষত্র খুব কমই গঠিত হয়।পরিবর্তে, বেশিরভাগ নক্ষত্র গঠিত হয় ঘন গ্যাসের মধ্যে, যেখানে পরমাণুগুলির সংঘর্ষের ফলে নতুন অণু তৈরি হয়।মূলত পারমাণবিক হাইড্রোজেন এবং বেশিরভাগ আণবিক গ্যাসের সমন্বয়ে গঠিত সৌরজগৎ-বহির্ভূত মেঘের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হতে পারে, আর তাই আর্গোনিয়াম ব্যবহৃত হয় একটি পারমাণবিক গ্যাস ট্রেসার হিসেবে।

ছিলিয়াম
জ্যোতিরসায়ন

ChemFusion
www.chemfusion.net

"হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল" নবায়নযোগ্য জ্বালানীর এক সম্ভাবনার নাম।

.'এনার্জি' বা 'শক্তি' এই শব্দটির সাথে আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক বসবাস।শক্তি আছে বলেই জগৎ গতিশীল, আধুনিকতার এই সময়ে শক্তি ছাড়া একটা দিন কল্পনা করাই বাহুল্য।আপনার হাতের মোবাইল ফোন, ইলেক্ট্রিক্যাল ডিভাইস, গাড়ি থেকে শুরু করে মহাশূন্যযান কোথায় নেই শক্তির ব্যবহার! শক্তির এই ব্যবহার আমাদেরকে যেমন নতুন নতুন সুবিধা দিয়েছে, তেমনি আমাদের কাছে চিন্তার এক কারণ হয়েও দাঁড়িয়েছে বৈকি।

আমরা ছোটবেলা থেকেই জেনে আসছি, "সকল শক্তির মূল উৎস সূর্য"।বর্তমানে আমাদের ব্যবহৃত শক্তির সিংহভাগই আসে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে যা পরোক্ষভাবে সূর্যের সাথে সম্পর্কিত।কিন্তু জীবাশ্ম জ্বালানি অনবায়নযোগ্য হওয়ায়, আমাদের ব্যবহারের সাথে সাথে দ্রুতগতিতে এর মজুদ কমে যাচ্ছে।সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই আমাদেরকে শক্তির নতুন কোন উৎস খুঁজতে হবে, যা আমাদের চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে।

.

অনবায়ন্যোগ্য শক্তির বিকল্প হিসেবে নতুন নতুন নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসের খোঁজ করা ও ব্যবহারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে বর্তমান সভ্যতা।কারণ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার পরিবেশের উপর ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।এছাড়াও অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যবহারের ফলে এর থেকে নির্গত CO_2, CO, SO_2, NO প্রভৃতি বিষাক্ত গ্যাসসমূহ বায়ুমণ্ডলের সাথে মিশে যাচ্ছে।ফলে, গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর পাশাপাশি বায়ুতে বিভিন্ন উপাদানের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, এসিড বৃষ্টি ও ফটোকেমিক্যাল ধোঁয়ার সৃষ্টি হচ্ছে, ওজন স্তর ক্ষয় হচ্ছে।এ সকল ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে এবং একই সাথে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে যুগোপযোগী সমাধান হিসেবে "হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল" এক আলোচিত নাম।

.

চলুন দেখে নেওয়া যাক, হাইড্রোজেন ফুয়েল সেলকে কেন এত গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে! হাইড্রোজেন ফুয়েল সেলে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় হাইড্রোজেন যা আমাদের মহাবিশ্বের সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়॥সুতরাং এর মজুদ নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে না! এছাড়াও হাইড্রোজেন এর এনার্জী ডেনসিটি অন্য যেকোনো মৌলের চেয়ে বেশি।

.

আবার ফুয়েল সেলে যেই বিক্রিয়াটি ঘটে তা হচ্ছে সবচেয়ে সাধারণ বিক্রিয়া।$2H_2+O_2=2H_2O$
এখানে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন বিক্রিয়া করে পানি তৈরি করে।যার ফলে দূষণ নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। মহাকাশযানের ক্ষেত্রে বর্তমানে এই উৎপাদিত পানিকে আরোহীগণ নিরাপদ পানীয় হিসেবে ব্যবহার করে আসছে।কিংবা এই পানিকে ভেঙ্গে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন তৈরি করা হলে, আরোহীদের অক্সিজেনের চাহিদাও মিটবে!

.

কোনরকম শব্দদূষণ, বায়ুদূষণ ছাড়াই হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল জ্বালানি শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত চলতে থাকে।পাশাপাশি অন্য নবায়নযোগ্য শক্তিকে সঞ্চয় করার জন্য আমরা হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল ব্যবহার করতে পারি, বিশেষ করে সোলার এনার্জীকে সংরক্ষণ করার জন্য।এছাড়াও রিজেনারেটিভ ফুয়েল সেল, হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল টেকনোলজিকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

.

যেহেতু, হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল একটি পরিবেশবান্ধব প্রক্রিয়া তাই আশা করা যায়, ভবিষ্যতে শক্তির নিরবচ্ছিন্ন উৎস হিসেবে হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল যথোপযুক্ত ভূমিকা পালন করবে।

ছিলিয়াম
জ্যোতিরসায়ন

ChemFusion
www.chemfusion.net

পানি দূষণ : প্রাণের অস্তিত্বে অন্যতম হুমকি

পানির অপর নাম জীবন- কথাটির সঙ্গে পরিচিত আমরা সবাই।পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রায় তিনভাগ জুড়ে বিস্তৃত এই প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে মানুষ ও অন্যান্য জীবকূলের জীবন কতোটা নিবিড়ভাবে জড়িত তা হয়ত বলার অপেক্ষা রাখে না।প্রাণের স্পন্দন সঞ্চারকারী এই পানিই যখন মৃত্যুর অন্যতম কারণ, অস্তিত্বের পথে ভয়াবহ এক হুমকি- বিষয়টি চিন্তিত হবার মতোই।যেই পানির অপর নাম জীবন, সেই পানিই দূষিত হলে জীবননাশক ।পানির দূষণ বলতে স্বাভাবিকভাবে বোঝানো হয় ভূগর্ভস্থ পানি বা মিঠা পানির উৎসসমূহে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকারক পদার্থের নিঃসরণ যেগুলো সময়ের সাথে বিনষ্ট হবার বদলে পানির দ্বারাই বাহিত হতে থাকে এবং পানির সার্বিক ব্যবহারিক মানদণ্ড ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার্থে বিঘ্ন ঘটায়।

রসায়নবিদের দৃষ্টিকোণে পানি হলো "সার্বজনীন দ্রাবক" ।ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত হবার সময় এই দ্রাবক যা কিছুর সংস্পর্শে আসে তার উল্লেখযোগ্য একটি অংশকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় দ্রবীভূত করে নেয়।পানির এই দ্রাবক ধর্ম বিপদজনক হয় তখনই যখন এসব উপাদানের উপস্থিতি নির্ধারিত মাত্রার বেশি হয়।প্রতিনিয়ত গৃহস্থালি ও শিল্পবর্জ্যের মাধ্যমে উন্মুক্ত এসব ক্ষতিকারক পদার্থের মধ্যে ভারী ধাতু, মাইক্রোপ্লাসটিকস, টেক্সটাইল ডাই, পেট্রোকেমিক্যালস,টক্সিক ফার্মাসিউটিক্যাল বর্জ্য (কারসিনোজেনস,মিউটাজেনস ও টেরাটোজেনস), অজৈব প্ল্যান্ট নিউট্রিয়েন্টস সহ আছে ক্ষতিকারক মাইক্রোঅরগানিজমও।কিছু ক্ষেত্রে জৈব দূষকসমূহের ভাঙনে কতিপয় ব্যাকটেরিয়ার সক্রিয় ভূমিকা থাকলেও, ভাঙন প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়া দ্বারা অতিরিক্ত অক্সিজেন ব্যবহারের কারণে পানির হাইপক্সিক অবস্থার সৃষ্টি হয় অর্থাৎ পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়।এমনকি অবাত অণুজীব কর্তৃক জৈব বর্জ্যের মেটাবলিক প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় মিথেন, হাইড্রোজেন সালফাইডের মতো বিষাক্ত গ্যাসও।
ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থের সরাসরি নির্গমন ছাড়াও কিছুক্ষেত্রে বাস্তুতান্ত্রিক জটিলতাও পানি দূষণের কারণ হয়। নিউট্রিয়েন্ট যেমন নাইট্রোজেন ও ফসফরাস ইকোসিস্টেমে জলজ উদ্ভিদের বৃদ্ধির প্রাইমারি লিমিটিং ফ্যাক্টর হিসেবে বিবেচিত।কিন্তু ওয়াটার বডিতে এসব নিউট্রিয়েন্টের অত্যধিক পরিমাণ শৈবাল ও প্লাঙ্কটন জাতীয় উদ্ভিদের জননহারকে সহায়ক করে তোলে।ভাসমান ফাইটোপ্ল্যাংকটন জাতীয় এসব উদ্ভিদ পানির গভীর স্তরগুলোতে সূর্যালোকের প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে সামগ্রিক একোয়াটিক ইকোসিস্টেম এর ভারসাম্যে ব্যাঘাত ঘটায় ।

দূষক পদার্থের অবারিত এবং অবৈধ উন্মুক্ততার জন্য ইতোমধ্যেই নিরাপদ পানির উৎস সংখ্যা পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলেই সীমিত হয়ে এসেছে।জনসংখ্যার সাথে পাল্লা দিয়ে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের দরুণ যেমন বাড়ছে দূষক পদার্থের মধ্যে মাত্রিকতা, তেমনি পরিধিতে বাড়ছে প্রাণিস্বাস্থ্যের উপর এগুলোর ক্ষতিকর প্রভাবও ।শিল্পবর্জ্য থেকে প্রতিনিয়ত পানিতে যে মাইক্রোপ্লাস্টিক ও ভারী ধাতু উন্মুক্ত হচ্ছে, মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীর খাদ্য শিকলে সেগুলোর অনুপ্রবেশ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন বিজ্ঞানীরা।
পানির গুরুত্ব, মানবসৃষ্ট কারণে পানি দূষণের তীব্রতা ও আগাম ভবিষ্যতে এর ভয়াবহ চিত্র অবলোকন করেই উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শুরু হয় পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা কে পরিবেশবান্ধব করার প্রচেষ্টা ।শুরুতে পানি দূষণ রোধের উপায় হিসেবে, 'Dilution is the solution to pollution' কে মূল বাণী রূপে গ্রহণ করা হলেও আধুনিক যুগে দূষণের মাত্রা বৃদ্ধিতে "ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও ব্যাপক নগরায়ণ' যেমনটা জটিল প্রভাবকের মতো কাজ করছে- তাতে করে প্রাকৃতিক উপায়ে পানির দূষণ রোধ এখন অনেকটাই অকার্যকর।উপরন্তু তিন স্তর বিশিষ্ট পানি পরিশোধন পদ্ধতির উপর গুরুত্বারোপের চেষ্টা চলছে।

প্রথম ধাপে, পানি থেকে কঠিন ধাতু ও ভাসমান বর্জ্য পদার্থ অপসারণ করা হয়, এ প্রক্রিয়ায় BOD মান হ্রাস পায় ৩৫ শতাংশ ।দ্বিতীয় ধাপে প্রায় সকল ভাসমান দূষক পদার্থ অপসারণ করা হয়।তৃতীয় ধাপের পরিশোধনে ৯৯ শতাংশ বর্জ্য অপসারণের মাধ্যমে পানি কে পানযোগ্য করা হয়; তবে এ প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট ব্যয়বহুল হওয়ায় শুধুমাত্র বিশেষ কিছু ক্ষেত্র ছাড়া এর প্রচলন সেভাবে নেই।যে কোনো স্তরের পরিশোধনের পর পানিকে প্রাকৃতিক জলাধারে উন্মুক্ত করার পূর্বশর্ত হচ্ছে জীবাণুমুক্তকরণ ।ক্লোরিনেশনের মাধ্যমে প্রচলিত উপায়ে পানিকে জীবাণুমুক্ত করা হলেও ক্লোরিনেটেড পানির নানারূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার প্রমাণ এসেছে সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায়।তাই অতিবেগুনি রশ্মির তেজস্ক্রিয়তা প্রয়োগ করে নির্বীজকরণে নির্ভরতা বাড়ছে।

পানি পরিশোধনের এত অত্যাধুনিক সব প্রযুক্তি থাকা সত্ত্বেও বিশেষত উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোয় দূষণের মাত্রা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বৃদ্ধি পাবার কারণ হিসেবে মূলত দুটি কারণকে চিহ্নিত করা যায়-

প্রথমত, পানি পরিশোধন প্রক্রিয়া গুলো ব্যয়বহুল এবং বিপুল শক্তি ব্যয়কারী।দরিদ্র দেশগুলোর তাই এক্ষেত্রে বিনিয়োগ সম্ভাবনা বরাবরই খুব কম।
দ্বিতীয়ত, পানি দূষণ ঠেকানোর পিছনে অর্থনৈতিক স্বার্থ পরিদৃশ্যমান না হওয়ায় পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে এই ক্ষেত্রে আগ্রহ নেই বললেই চলে।তাই এসব প্রযুক্তির ব্যবহার, উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণে বিনিয়োগ ও সদিচ্ছার যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

ধারণা করা হচ্ছে একুশ শতকে মানবজাতির সম্মুখীন চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হবে - পর্যাপ্ত গুণগতমান বিহীন পানির অভাব, যার সরাসরি প্রভাব দৃশ্যমান হবে বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন আন্তসম্পর্কিত প্রক্রিয়াগুলোতে, পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্য উৎপাদনে এবং একইসাথে পরোক্ষভাবে আর্থসামাজিক উন্নয়নে।ইউনেস্কোর World Water Assesment Programme এর এক সমীক্ষা অনুযায়ী ২০২৫ সাল নাগাদ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় ১.৮ বিলিয়ন মানুষ সুপেয় পানির অভাবজনিত সমস্যায় পড়বে।এটা অনস্বীকার্য যে আমরা যদি এখনই পানি দূষণ রোধ ও মিঠা পানির উৎসের যথার্থ রক্ষণাবেক্ষণে সচেতন না হই, তবে খুব দ্রুতই আমাদের এই অত্যাবশ্যক সম্পদটি শেষ হয়ে যাবে।

ছিলিয়াম
জ্যোতিরসায়ন

ChemFusion
www.chemfusion.net

মেটাল অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্ক

Metal Organic Framework (MOF) দ্বারা এমন সব যৌগকে নির্দেশ করে যাতে ধাতব আয়নসমূহ বিভিন্ন জৈব অণুর সাথে সন্নিবেশের (Coordination) মাধ্যমে দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক কাঠামো তৈরি করে। এই যৌগগুলোর বিশেষ কিছু ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এটি বর্তমানে বিজ্ঞানের অন্যতম সেরা আবিষ্কার হিসেবে পরিগনিত হচ্ছে।

Metal Organic Framework মূলত একটি সন্নিবেশ পলিমার; এতে কতগুলো Secondary building units পরস্পরের সাথে দ্বি বা ত্রিমাত্রিকভাবে সংযুক্ত হয়ে বিশাল পৃষ্ঠতল সম্বলিত একটি ছিদ্রযুক্ত কাঠামো তৈরি করে। ধাতব আয়ন হিসেবে সাধারণত পর্যায় সারণীর অবস্থান্তর ধাতুসমূহ উপস্থিত থাকে। জৈব অণুসমূহ পলিমারের প্রতিটি এককের মধ্যে সংযোগ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।জৈব লিগ্যান্ড হিসেবে সাধারণত বাই বা ট্রাই কার্বক্সিলিক এসিড ব্যবহার হয়।MOF এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এর কাঠামোতে অসংখ্য ছিদ্রের (pores) উপস্থিতি।এগুলো সাধারণ অবস্থায় দ্রাবক অণু দ্বারা পূর্ণ থাকলেও প্রয়োজন অনুযায়ী এতে আকৃতিভেদে অন্য ছোট-বড় যৌগ প্রতিস্থাপন সম্ভব।আবার, এই ছিদ্রগুলোর আকৃতিও পরিবর্তনযোগ্য । বর্তমানে ভিন্ন ভিন্ন ধাতু ও জৈব যৌগের পৃথক পৃথক সম্বন্বয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন গঠন ও পৃষ্ঠতল বিশিষ্ট অসংখ্য MOF তৈরি করা হচ্ছে।

জৈব ও ধাতব যৌগের সংমিশ্রণে গঠিত এই কাঠামোগুলোর বিভিন্ন ব্যবহারিক প্রয়োগ নির্নয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে যাচ্ছেন।গত কয়েক দশক যাবত MOF এর নিত্যনতুন বিভিন্ন ব্যবহার আবিষ্কার এবং সেগুলোর আকর্ষণীয় প্রয়োগ ক্ষমতা বিজ্ঞান জগতে ব্যাপক সাড়া পাচ্ছে।

তবে এখন জেনে নেওয়া যাক, MOF এর কিছু পরীক্ষিত ও সম্ভাব্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রের কথা :

গ্যাস সংরক্ষণে :

বর্তমানে MOF এর সবচেয়ে কার্যকরী ব্যবহার হচ্ছে বিভিন্ন গ্যাসীয় অণু সংরক্ষণ ও পরিবহনের ক্ষেত্রে।বিশ্বে জনসংখ্যার দ্রুত ক্রমবৃদ্ধির কারণে অনবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎসের যোগান প্রায় শেষের পথে।আবার, বিদ্যমান জ্বালানি উৎসের বেশিরভাগই পরিবেশের ক্ষতির কারণ হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে কম খরচে, পরিবেশবান্ধব নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎসের সন্ধান প্রয়োজন।এই তালিকায় এগিয়ে আছে ছোট গ্যাসীয় পদার্থ হাইড্রোজেন।হাইড্রোজেনকে ভবিষ্যৎ ফুয়েল হিসেবে ব্যবহারের সফল সম্ভাবনা দেখছেন গবেষকরা।কিন্তু এই জ্বালানির অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো সাধারণ চাপে হাইড্রোজেন গ্যাস সংরক্ষণ এবং নির্ধারিত স্থানে পরিবহন। এই কাজে MOF এর প্রয়োগ সম্ভব।বৃহৎ পৃষ্ঠতলীয় গঠন এবং পরিবর্তনযোগ্য রাসায়নিক কাঠামো থাকার কারণে MOF হাইড্রোজেন সংরক্ষণে ব্যবহার করা যায়; হাইড্রোজেন অণু এই যৌগগুলোর পৃষ্ঠে অধিশোষিত হয়।

প্রভাবক হিসেবে :

MOF এর একটি সম্ভাবনাময় প্রয়োগক্ষেত্র হতে পারে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় প্রভাবক হিসেবে।কারণ :

পরিবর্তনশীল ছিদ্রযুক্ত গঠন

ব্যবহৃত জৈব লিগ্যান্ড, ধাতুর অনুপাত ও সম্বন্বয়ের প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করার সুযোগ

জিওলাইটসহ অন্যান্য ধাতব প্রভাবক অপেক্ষা তুলনামূলক সহজে প্রস্তুত পদ্ধতি

এছাড়াও বিভিন্ন অপ্রতিসম সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায়, আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ায় প্রভাবক হিসেবে MOF ব্যবহার করা সম্ভব। বর্তমানে বিভিন্ন তড়িৎ-রাসায়নিক বিক্রিয়ায় MOF প্রভাবক ব্যবহারের চেষ্টা হচ্ছে।

ড্রাগ ডেলিভারিতে :

বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে আমরা যেসব ওষুধ গ্রহণ করি সেগুলো খাদ্যনালী হয়ে নির্ধারিত স্থানে পরিবহনে কিছু ড্রাগ ক্যারিয়ার ব্যবহৃত হয়।দেহের নির্দিষ্ট pH, তাপমাত্রা, চাপ এবং আয়নের ভারসাম্য বজায় রেখে কোনোরকম বিষক্রিয়া প্রদর্শন ছাড়াই ড্রাগগুলোকে নির্ধারিত অঙ্গে মুক্ত করতে পারে এমন ক্যারিয়ার যৌগের সন্ধান করছেন বিজ্ঞানীরা।এইক্ষেত্রে MOF ব্যবহারে সাফল্যের দেখা মিলেছে। প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত γ-সাইক্লোডেক্সট্রিন এর সঙ্গে পটাশিয়াম ধাতুর সম্বন্বয়ে তৈরি CD MOF-1 বেশ কয়েকটি বহুল ব্যবহৃত ড্রাগ ডেলিভারিতে ব্যবহার করা গিয়েছে।

জৈব সেন্সর হিসেবে :

বিভিন্ন বায়োলজিকাল ইমেজিং প্রক্রিয়ায় সেন্সর হিসেবে ফটোলুমিনিসেন্স প্রদর্শনকারী ল্যান্থানাইড যৌগের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।তবে এই যৌগগুলোর প্রত্যক্ষ Sensitization সম্ভব হয় না বলে সমস্যা সমাধানের বিকল্প মাধ্যম খোঁজা হচ্ছে। এক্ষেত্রে ল্যান্থানাইড ধাতুসমূহ দ্বারা তৈরি MOF এর ব্যবহার Sensitizing প্রক্রিয়া সহজ ও কার্যকর করতে পারে।

এছাড়াও বিভিন্ন MOF যৌগ সেমিকন্ডাক্টর হিসেবে, নিউক্লিয়ার বর্জ্য অপসারণে, পানি পরিশোধনে, বিক্রিয়া মাধ্যম হতে অপ্রয়োজনীয় আয়ন অপসারণে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কোভিড-১৯ ও মেডিসিনাল কেমিস্ট্রি

পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ে মহামারীর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জনজীবন, প্রান হারিয়েছেন লাখো মানুষ।বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় ২০০ এর অধিক দেশে বিস্তীর্ণ জনপদে মৃত্যুযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে তেমনই এক মহামারী, কোভিড-১৯।এই মহামারীর জন্য দায়ী একটি অনুজীব, SARS CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2) যা সংক্ষেপে করোনা ভাইরাস নামে পরিচিত।২০১৯ এর ডিসেম্বরে চীনের একটি প্রদেশ হতে প্রথম শনাক্তকরণের পর থেকে বর্তমান সময় অবধি এই RNA ভাইরাসটির আক্রমণের শিকার হয়েছেন প্রায় ১৫ কোটি মানুষ, মৃত্যুবরণ করেছেন প্রায় ৩০ লাখ।আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি, কাশির সাথে নির্গত অতিক্ষুদ্র Respiratory droplets এর মাধ্যমে বিস্তার লাভ করার কারণে এই ভাইরাসের সংক্রমণ খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন দেশে। আকস্মিক এই অদৃশ্য শত্রুর আক্রমণে সাধারণ মানুষ যখন অসহায়, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তখন স্থায়ী প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসার সবটুকু সামর্থ্য নিয়ে পাশে ছিলেন চিকিৎসক ও সেবাদানকারী কর্মীরা।তবে পর্দার আড়ালের আরেক দল মানুষ সর্বক্ষণ নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কোনো স্থায়ী প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরি অথবা আক্রান্ত ব্যক্তিদের সুস্থ করার চেষ্টায়।তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ভূমিকা রাখছেন রসায়নবিদেরা। তাহলে এখন গবেষকদের অবিচল এই রাসায়নিক পথচলার গল্পের কিছুটা জেনে আসা যাক।এই যাত্রায় একইসঙ্গে যেমন রয়েছে প্রাপ্তি ও সাফল্যের স্বস্তি তেমনি ব্যর্থতা থেকে হার না মানা ও ঘুরে দাঁড়ানোর প্রেরণা।

কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ শুরুর পর থেকেই এর জন্য দায়ী ভাইরাসটির (SARS CoV-2) বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরির প্রচেষ্টা শুরু হয়।ভাইরাসটি কিভাবে মানবদেহে আক্রমণ করে এবং কিভাবে অভ্যন্তরীণ মারাত্মক ক্ষতিসাধনের মাধ্যমে মানুষকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয় সেইসব নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা শুরু করেন বিজ্ঞানীরা।ভাইরাসটির গঠন বৈশিষ্ট্য ও জিনোম সিকুয়েন্স নির্নয় করা হলে দেখা যায়, এর কার্যপদ্ধতির সঙ্গে পূর্বে আবিষ্কৃত SARS, MERS এবং SARS CoV ভাইরাসের যথেষ্ট সামঞ্জস্য রয়েছে।এটি গবেষকদের জন্য একপ্রকার আশার আলোর সন্ধান দেয় কারণ ঐ ভাইরাসগুলোর প্রতিকারে কিছু সফল গবেষণালব্ধ ফলাফল তাদের হাতে ছিল।করোনা ভাইরাসটি মূলত এনভেলপযুক্ত একটি RNA ভাইরাস যা এর এনভেলপে উপস্থিত এক প্রকার স্পাইক প্রোটিনের মাধ্যমে মানবদেহের AGCE-2 (Angiotensin Converting Enzyme 2) এর সাথে যুক্ত হয়।কোষে প্রবেশের পর ভাইরাসের RNA বাহকের কোষে উপস্থিত রাইবোজোমের সাথে যুক্ত হয় এবং তা থেকে দুইটি পলিপ্রোটিন তৈরি করে, এই প্রোটিনগুলোই পরবর্তীতে ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।এই পলিপ্রোটিন দুইটির বিভাজনে আবার কাজ করে দুইটি পৃথক এনজাইম : 3CLpro (Corona virus main protease) এবং PLpro (papain like protease)।তাছাড়া ভাইরাল RNA রেপ্লিকেশনের জন্য করোনাভাইরাস ব্যবহার করে RNA dependent RNA polymerase (RdRp) নামক এনজাইম।অর্থাৎ, এই প্রোটিনগুলোর যেকোনো এক বা একাধিক এর কাজে বাধা দিতে পারলেই ভাইরাসের সংযুক্তি ও বৃদ্ধি থামানো সম্ভব।এভাবেই মেডিসিনাল কেমিস্টরা পেয়ে গেলেন ঔষধ তৈরির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রধান টার্গেটগুলো।শুরু হলো দ্রুততম সময়ে, অধিক কার্যকরী ও অপেক্ষাকৃত কম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াসম্পন্ন ঔষধ তৈরির যাত্রা।

যেহেতু ভাইরাসটি অতিদ্রুতই অসংখ্য মানুষের ক্ষতিসাধন করছে, তাই গবেষকদের লক্ষ্য ছিল মূলত পূর্বে অন্যান্য ভাইরাসজনিত অসুস্থতায় ব্যবহৃত ঔষধগুলোর সাথে SARS CoV-2 ভাইরাসের Screening এর মাধ্যমে কার্যকরী ব্যবস্থা খুঁজে বের করা।এক্ষেত্রে গবেষকরা সহায়তা নিয়েছেন Computational methods ও In-vitro assay এর অসংখ্য উপাত্তের।

যদিও ভাইরাসটির দ্রুত মিউটেশন, মানুষভেদে আক্রমণ ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সংক্রমণের মাত্রার ভিন্নতার কারণে এখন পর্যন্ত সম্পুর্ণরুপে কার্যকর কোনো ঔষধ আবিষ্কার সম্ভব হয় নি, তবে কোভিড-১৯ এর চিকিৎসায় বেশ কিছু ঔষধ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও FDA (Food & Drug Administration) কর্তৃক অনুমোদন পেয়েছে যেগুলো বিভিন্ন পর্যায়ে ভাইরাসের সংক্রমণ হ্রাস ও সংক্রমিত রোগীর চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।এই ঔষধগুলো মূলত ভাইরাসের বিভিন্ন এনজাইমের কাজে বাধা প্রদানের মাধ্যমে এর সংক্রমণ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।এছাড়াও রসায়নবিদেরা খোঁজ করছেন প্রাকৃতিক কোনো উৎস থেকে অথবা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগ সংশ্লেষণে, যেগুলো উপযুক্ত রুপান্তরের মাধ্যমে কার্যকর ঔষধ পাওয়া সম্ভব হবে।

গবেষকরা কিন্তু শুধুমাত্র ঔষধ আবিষ্কারেই থেমে থাকেন নি, বিকল্প বেশ কিছু কার্যকরী চিকিৎসা পদ্ধতির সন্ধান করেছেন তারা।বিভিন্ন এন্টিবডি থেরাপি, প্লাজমা থেরাপি অসংখ্য রোগীর জীবন বাঁচাতে সহায়তা করছে।

এছাড়াও এই মরণঘাতী ভাইরাসের বিরুদ্ধে দেহে প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরির জন্য গবেষকরা তৈরি করছেন বিভিন্ন টিকা বা ভ্যাক্সিন।এই ভ্যাক্সিনগুলো ভাইরাসের DNA, mRNA অথবা ভাইরাল প্রোটিনের কিছু অংশ আগে থেকেই দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, যাতে পরবর্তীতে ভাইরাসের আক্রমণের সাথে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিজেই এন্টিবডি তৈরির মাধ্যমে ভাইরাস ধ্বংস করতে পারে।ইতিমধ্যে Pfizer-Biontech, Oxford-Astrazeneca সহ আরো বেশ কিছু ভ্যাক্সিন অনুমোদিত ও ব্যবহৃত হচ্ছে যা কোভিড-১৯ এ সংক্রমণ ও মৃত্যুহার অনেকাংশে কমিয়ে আনছে।

যেকোনো রোগের ঔষধ তৈরিতে প্রধান রাসায়নিক যৌগ শনাক্তকরণ থেকে উৎপাদিত ঔষধ বাজারজাতকরণের প্রক্রিয়াটি বেশ জটিল, ব্যয়বহুল, কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ।মহামারীর এই সময়ে মানুষের জীবনরক্ষার্থে গবেষকরা নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত।তবে আমাদের সচেতনতা ব্যতীত তাদের এই প্রচেষ্টা সার্থক হওয়া সম্ভব নয়।আসুন তবে তাঁদেরকে ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্যই না হয় একটু সচেতন হই আমরা!!

ChemFusion
www.chemfusion.net

'বুক অব স্টোনস'

কৃত্রিম কাঁকড়া, সাপ, এমনকি মানুষ তৈরির প্রণালী।আর এই কাজগুলোকে জাবির ইবনে হাইয়্যান ‘তাকবিন’ বলে সংজ্ঞায়িত করতেন।আরবী শব্দ তাকবিন অর্থ গঠন।তিনি তার গবেষণাগারে এ সংক্রান্ত অনেক গবেষণা করেছেন।গবেষণাগারে সৃষ্ট এই তাকবিনগুলো আবার তাদের সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে।এ ধরনের গবেষণার জন্য তাকে অনেকেই ধর্ম বিচ্যুত বলে গালমন্দ করতো।তবে, জাবির ছিলেন প্রচন্ড ধর্মভীরু মানুষ।"বুক অব স্টোনসে" বারবার উল্লেখ করেছেন, প্রাণের সঞ্চার আল্লাহ ছাড়া কেউ করতে পারে না এবং তাই, এসব সৃষ্টি করতে হলে আল্লাহর একনিষ্ঠ উপাসক হতে হবে।বইয়ের শুরুর দিকে তিনি দীর্ঘ মোনাজাতও যোগ করেছেন।তার মতে আলকেমি বিষয়ক কোনো গবেষণা শুরুর আগে মরুভূমিতে গিয়ে একাকী এ দোয়া পাঠ করলেই তবে গবেষণা সফল হবে।যদিও আধুনিক বিজ্ঞান এই চিন্তা সমর্থন করেনা
আচ্ছা এবার আসি আলকেমিতে , আলকেমি কি? অনেকগুলো অর্থের মধ্যে একটি হচ্ছে "অপরসায়ন" "গুপ্তবিদ্যা " ।কি ভিমরি খেলেন ? ।

গুপ্তবিদ্যার প্রতি মানুষের যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে।‘আল-কেমি’ হচ্ছে সেই রকম গুপ্তবিদ্যা, যার দ্বারা মানুষ ‘এলিক্সির’ নামে একটি যাদুকরী বস্তু তৈরি করতে সক্ষম হবে।আর এই এলিক্সিরের ছোঁয়ায় লোহা হয়ে যাবে সোনা, তামা হয়ে যাবে রূপা, আর মানুষের আয়ু যাবে বহুগুণ বেড়ে!

লোহা থেকে সোনা বানানো কিংবা জীবনকে দীর্ঘায়িত করার বাসনাই ছিল আল-কেমি বিদ্যার মূল উদ্দেশ্য।আল-কেমি বহু আগে থেকে চলে আসা একটি বিষয়, পৃথিবীর মানুষ লোহা থেকে সোনা বানানোর অসম্ভব চেষ্টা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই করছে।আল-কেমি বিদ্যাটি কিছুটা গুপ্ত হওয়ায় জাবেরের বইগুলোও অনেকটা রূপক ভঙ্গীতে লেখা।আল-কেমি বিষয়ে লেখা তার বই ‘কিতাব আল জোহরা’-তে তিনি লিখেছেন, ‘আল্লাহ যাদের ভালবাসেন তারা ব্যাতীত বাকিদের হতভম্ব করা এবং ভুল পথে নেয়াই এর উদ্দেশ্য।

আবার এই জাবিরই লিখেছেন, ‘আমার ‘মাস্টার’ আমাকে শাসাচ্ছেন, যাতে এসব বিদ্যা কোন অবিবেচকের হাতে না পড়ে।আল-কেমির বিদ্যা গুপ্ত রাখার মানসিকতায় তিনি এ সংক্রান্ত বইগুলো রূপকভাবে লিখেছেন সাধারণ যাতে সহজে সেসব বুঝতে না পারে।

আল-কেমির চর্চা ও অনুশীলন থেকে জাবির একসময় আবিষ্কার করলেন অনেক কিছু।তিনি আবিষ্কার করেন কী করে তরলের মিশ্রণ থেকে একটি তরলকে আলাদা করা যায়, যা ডিস্টিলেশন নামে পরিচিত।আবিষ্কার করেন একুয়া রেজিয়া নামে একটি মিশ্রণ যা সোনাকে গলিয়ে দিতে সক্ষম এবং উদ্ভাবন করেন অগুনতি কেমিক্যাল সাবস্ট্যান্স– যা মরিচা প্রতিরোধ, স্বর্ণের কারুকাজ, পোশাকের ওয়াটারপ্রুফসহ বিভিন্ন শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত হয়।আল-কেমি থেকে তিনি সিস্টেমেটিক এক্সপেরিমেন্টেশনের দ্বারা শুরু করেন আরেকটি বিষয়, যা পরিচিতি লাভ করে কেমেস্ট্রি হিসেবে।

ইংরেজিতে একটি শব্দ আছে, ‘জিবারিশ’, অর্থ ‘অর্থহীন’।মজার ব্যাপার এই শব্দটি এসেছে মূলত জাবির নাম থেকেই! আলকেমি নিয়ে জাবির ইবনে হাইয়্যানের অনেক কাজই আধুনিককালের রসায়নবিদের কাছে অর্থহীন মনে হয়েছে।আর তা থেকে জাবিরীয় কাজগুলো, অর্থাৎ ইংরেজিতে ‘জিবারিশ’ শব্দটির অর্থই হয়ে গেছে অর্থহীন।তবে, অনেক রসায়নবিদ এক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করে থাকেন।তাদের মতে, জাবিরের আলকেমি বিষয়ক অধিকাংশ কাজই ছিল অতি গোপন এবং শুধুমাত্র তার শিষ্যদের জন্য উন্মুক্ত।ফলে, আজকের যুগে বসে লিখিত বিবরণ পড়ে তা বোঝা দুঃসাধ্য।

জাবির ইবনে হাইয়্যান ইতিহাসে অধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছেন রসায়নে তার অবদানের কারণে।সে সময় রসায়ন বলতে যা ছিল সবই আলকেমি নামের অপরসায়ন।জাবিরের আলকেমি বিষয়ক কাজগুলোর মধ্যে যেগুলো আধুনিক রসায়নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেগুলোকে আজকের বিজ্ঞান রসায়ন হিসেবে গ্রহণ করেছে।জাবির কেবল আলকেমির অতীন্দ্রিয়তার মধ্যেই ডুবে থাকেননি।তিনি কিছু অসাধারণ কাজও করেছেন, যেগুলোর জন্য তার নিকট আজকের রসায়ন ঋণী হয়ে থাকবে।তার কাজগুলোই পরবর্তী সকল মধ্যযুগীয় বিজ্ঞানীদের আলকেমি নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী করেছে।

কেবল সাধারণ ধাতুকে স্বর্ণে রূপান্তরের প্রচেষ্টায় মগ্ন না থেকে, জাবির ইবনে হাইয়্যান অনেক সময়োপযোগী কাজ করেছেন। ইস্পাত তৈরি, লোহার মরিচা রোধ, স্বর্ণালঙ্কারে মসৃণ খোদাই, কাপড় রঙ করার প্রণালী, চামড়ার ট্যানিং, বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থের সংশ্লেষণের মতো বেশ কিছু কার্যকরী কাজ করেছেন তিনি।তিনিই প্রথম কাঁচ তৈরিতে ম্যাংগানিজ ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করেছিলেন, যা আজ অবধি ব্যবহৃত হচ্ছে।তার বুক অব স্টোনস ছাড়াও, ‘বুক অব দ্য কম্পোজিশন অব আলকেমি’, ‘বুক অব ব্যালেন্সেস’, ‘বুক অব কিংডম’ সহ বেশকিছু বই ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন রোবার্ট অব চেস্টার নামক এক ব্যক্তি।

বইগুলো এত প্রভাবশালী হয়ে ওঠে যে, পরবর্তী কয়েকশো বছর সেগুলো ইউরোপজুড়ে আলকেমির প্রধান পাঠ্যবই হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

আলকেমির উন্নয়নের ধারাবাহিকতায়, আধুনিক রসায়নে জাবির ইবনে হাইয়্যানের অবদানগুলো-

- আলকেমিতে পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণের প্রচলন;
- খনিজ ধাতু নিয়ে গবেষণার দ্বার উন্মোচন;
- উষ্ণতা, আর্দ্রতা, শীতলতা ও শুষ্কতা- এ চারটি বিষয়ের বিস্তারিত বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ;
- নাইট্রিক এবং সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদন;
- বিভিন্ন খনিজ ধাতু থেকে স্বর্ণ পৃথকীকরণ;
- পারদের বিশুদ্ধিকরণ ও লবণকে পানিতে সম্পূর্ণ দ্রবণীয় বলে আখ্যায়িতকরণ;
- অ্যাকোয়া রেজিয়া’ প্রস্তুতকরণ, যা স্বর্ণকে দ্রবীভূত করতে পারে;
- ক্ষারের ইংরেজি প্রতিশব্দ ‘অ্যালকালি’র প্রচলন;
- স্ফটিকিকরণের মাধ্যমে বিশুদ্ধিকরণ;
- সিলভার নাইট্রেটের অধঃক্ষেপণ;
- মারকিউরাস অক্সাইড ও মারকিউরিক অক্সাইডের অধঃক্ষেপণ;
- আর্সেনিয়াস অ্যাসিড প্রস্তুতকরণ।

এতক্ষণ রসায়নে জাবিরের অবদান জানলাম, চলুন তার জীবন থেকে একটু ঘুরে আসি।আমাদের আপাতত টাইম মেশিনে ফিরতে হবে মধ্যযুগের ইরানে।

জাবির ইবনে হাইয়ান-এর পূর্ণ নাম হলো– আবু আবদুল্লাহ জাবির ইবনে হাইয়ান।তিনি আবু মুসা জাবির ইবনে হাইয়ান নামেও পরিচিত।কেউ কেউ তাঁকে 'আল হারারানী' এবং 'আবু সুফী' নামেও অভিহিত করেন।ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অবশ্য তাঁর নাম বিকৃত করে জিবার (Geber) লিপিবদ্ধ করেন।

তিনি কবে জন্মগ্রহণ করেন তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না।যতদূর জানা যায়, তিনি ৭২২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাইয়ান।আরবের দক্ষিণ অংশে জাবিরের পূর্ব পুরুষগণ বাস করতেন।তাঁরা ছিলেন আজাদ বংশীয়।স্থানীয় রাজনীতিতে আজাদ বংশীয়রা বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন।পরবর্তীতে জাবিরের পিতা হাইয়ান পূর্ব বাসস্থান ত্যাগ করে কুফায় গিয়ে বসবাস শুরু করেন।তিনি ছিলেন চিকিৎসক ও ঔষধ বিক্রেতা।

জানা যায়, উমাইয়া বংশীয় খলিফাগণের নিষ্ঠুর ও অমানবিক কার্যকালাপের দরুন হাইয়ান উমাইয়া বংশের প্রতি বিদ্বেষ মনোভাব পোষণ করতেন।সেহেতু তিনি পারস্যের কয়েকটি প্রভাবশালী বংশের সঙ্গে পরামর্শ ও ষড়যন্ত্র করবার জন্য আব্বাসীয়দের দূত হিসাবে কূফা ত্যাগ করে তূস নগরে গমন করেন।এ তূস নগরেই জাবিরের জন্ম হয়।হাইয়ানের ষড়যন্ত্রের কথা অতি শীঘ্রই তৎকালীন খলিফার দৃষ্টিগোচর হয়।খলিফা তাঁকে গ্রেপ্তার করে মৃত্যুদণ্ড দেন।হাইয়ানের পরিবার পরিজনদের পুনরায় দক্ষিণ আরবে প্রেরণ করেন।

দক্ষিণ আরবেই জাবির ইবনে হাইয়ানের শিক্ষালাভের কার্যক্রম শুরু হয়।শিক্ষালাভের প্রতি তার ছিল পরম আগ্রহ।যে কোন বিষয়ে বই পেলে তিনি তা পড়ে শেষ করে ফেলতেন এবং এর উপর গবেষণা চালাতেন।খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এখানে গণিতের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ পারদর্শী বলে খ্যাত হয়ে উঠেন।

শিক্ষা সমাপ্তির পর জাবির ইবনে হাইয়ান পিতার কর্মস্থল কূফা নগরীতে গিয়ে বসবাস শুরু করেন।সেখানে তিনি প্রথমে চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং এ সূত্রেই তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিত ইমাম জাফর সাদিকের অনুপ্রেরণায় তিনি রসায়ন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে গবেষণা শুরু করেন।কারো মতে জাবির ইবনে হাইয়ান খলিফা খালিদ বিন ইয়াজিদের নিকট রসায়ন বিদ্যা শিক্ষালাভ করেছিলেন।

কিন্তু এই কথার কোন সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়নি।কারণ জাবির ইবনে হাইয়ানের কার্যাবলীর ব্যাপ্তি ছিল খলিফা হারুন-উর রশীদের রাজত্বকালে।অথচ খলিফা খালিদ বিন ইয়াজিদ, হারুন-উর রশীদের বহু পূর্বেই ইন্তেকাল করেন।যতদূর জানা যায়, জাবির ছিলেন ইমাম জাফর সাদিকেরই শিষ্য।খুব অল্প সময়ের মধ্যেই রসায়ন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।এ সময় ছিলো আব্বাসীয় খলিফা হারুন-উর রশীদের রাজত্বকাল।কিন্তু খলিফা হারুন-উর রশীদের সাথে তার তেমন কোণ পরিচয় ও সাক্ষাৎ হয়নি।কিন্তু খলিফার বারমাক বংশীয় কয়েকজন মন্ত্রীর সাথে তার গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো।ইমাম জাফর সাদিকই জাবিরকে বারমাক বংশীয় কয়েকজন মন্ত্রীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন।

একবার ইয়াহিয়া বিন খালিদ নামক জনৈক বারমাক মন্ত্রীর এক সুন্দরী দাসী মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।তৎকালীন দেশের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ তাঁর চিকিৎসা করে ব্যর্থ হন।এ সময় মন্ত্রী প্রাসাদে চিকিৎসার জন্য ডাক পড়ে জাবির ইবনে হাইয়ানের।জাবির মাত্র কয়েকদিনের চিকিৎসার মাধ্যমে তাকে সুস্থ করে তোলেন।এতে ইয়াহিয়া বিন খালিদ খুব সন্তুষ্ট এবং জাবিরের সাথে তার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

বারমাক বংশীয় কয়েকজন মন্ত্রীর মধ্যস্থতায় তিনি রাষ্ট্রীয় কিছু সুযোগ সুবিধা লাভ করেন।এর ফলে তিনি রসায়ন বিজ্ঞান সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা করার সুযোগ পান।মন্ত্রী ইয়াহিয়া এবং তাঁর পুত্র জাবিরের নিকট রসায়ন বিজ্ঞান শিক্ষা শুরু করেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে নতুন নতুন তথ্য ও বিভিন্ন পদার্থ আবিষ্কার করতে আরম্ভ করেন।খুব অল্প দিনের মধ্যেই তিনি শ্রেষ্ঠ রসায়ন বিজ্ঞানী হিসাবে পরিচিত হন।জাবির ইবনে হাইয়ান প্রতিটি বিষয়ই যুক্তির সাহায্যে বুঝবার ও অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন।

তিনি সর্বদা হাতে কলমে কাজে করতেন।প্রতিটি বিষয়ে পুঙ্খানমুঙ্খ রূপে পর্যবেক্ষণ করে তার ফলাফল লিখে রাখতেন।তিনি তার 'কিতাবুত তাজে' পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, 'রাসায়নের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাজ হলো হাতে-কলমে পরীক্ষা চালানো।যে হাতে-কলমে কিংবা পরীক্ষামূলক কাজ করে না, তার পক্ষে সামান্যতম পারদর্শিতা লাভ করাও সম্ভব নয়।

জাবির তার জীবনের অধিকাংশ সময়ই বাগদাদে কাটিয়েছেন।কিতাবুল খাওয়াসের ঘটনাবলী থেকে বুঝা যায় যে, অষ্টম শতাব্দীর শেষ দিকে বাগদাদেই তিনি রসায়ন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে তার গবেষণা চালিয়েছিলেন।বাগদাদেই তার রসায়নাগার স্থাপিত ছিল।উল্লেখ্য যে, জাবিরের মৃত্যুর ১০০ বছর পরে কূফায় অবস্থিত দামেশ্ক তোরণের নিকট রাস্তা নতুন করে তৈরি করতে কতকগুলো ঘর ভেঙ্গে ফেলার সময় একটি ঘরে ২০০ পাউন্ডের একটি সোনার থালা ও একটি খল পাওয়া যায়। ফিহরিস্তের মতে, এটি ছিল জাবিরের বাসস্থান ও ল্যবরেটরি।ঐতিহাসিক হিট্টিও এ ঘটনার সত্যতা শিকার করেন।

ইতিহাসে ৩ হাজারের অধিক ছোট বড় গ্রন্থ, প্রবন্ধ, গবেষণা পাওয়া যায় জাবির ইবনে হাইয়্যানের নামে।তবে এগুলোর মাঝে অনেকগুলোই বিতর্কিত।গবেষকদের মতে, জাবির ইবনে হাইয়্যানের অনুসারীদের পরবর্তী কাজ এবং গবেষণাগুলোও জাবিরের নামে প্রচলিত হয়ে গেছে।আবার অনেকের মতে, ৩ হাজার জাবিরীয় লেখা সংকলনের অধিকাংশই জাবিরের নিজস্ব কাজ।তার লেখা সংকলনে সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে শুরু করে রসায়ন, জীববিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, গণিত, জ্যামিতি, সঙ্গীত, দর্শন, অধিবিদ্যা, যুক্তিশাস্ত্র, প্রযুক্তি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, ব্যাকরণ সহ জ্ঞানের অসংখ্য শাখায় তার পদচারণার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ল্যাটিন ভাষায় জাবির ইবনে হাইয়্যান জেবার নামে পরিচিত।কিন্তু এই নাম নিয়েই ত্রয়োদশ শতকে একটি সমস্যার উদ্ভব হয়, যা সিউডো-জেবার বা ছদ্মজেবার নামে পরিচিত।১৩ শতকে কোনো এক অজানা ব্যক্তি আলকেমির উপর বেশ কিছু বই লিখেছিলেন, যেগুলোতে তিনি ছদ্মনাম জেবার ব্যবহার করেন।প্রাথমিকভাবে, ল্যাটিন ভাষায় প্রকাশিত সে বইগুলোকে জাবিরের কোনো অখ্যাত কাজের অনুবাদ বলেই ধরে নেয়া হয়।কিন্তু ১৫ শতকের পর থেকে আরো বিস্তারিত গবেষণায় অনেকেই সেগুলো নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন।১৮ ও ১৯ শতকে এই বিতর্ক আরো জোর পায় এবং সিউডো-জেবার তত্ত্বের প্রচলন হয়।বর্তমানে অধিকাংশ ইতিহাসবিদই মনে করেন সেই নির্দিষ্ট সংখ্যক বইগুলো আসলে কোনো এক অপরিচিত, অখ্যাত ল্যাটিন আলকেমিস্টের লেখা।কিন্তু এই তত্ত্ব এখনো প্রমাণিত হয়নি।তাই বিতর্ক এখনও বিদ্যমান।

কী প্রমাণিত হয়েছে আর কোনটি এখনো বিতর্কিত, এসব একপাশে রেখেও জাবির ইবনে হাইয়্যানকে মধ্যযুগের তো বটেই, ইতিহাসের একজন গুরুত্বপূর্ণ রসায়নবিদ হিসেবে গণ্য করা যায়।তার অবদানের জন্য মধ্যযুগ জুড়ে তিনি ছিলেন সবচেয়ে প্রভাবশালী আলকেমিস্ট।ইউরোপীয়দের নিকটও তিনি সমান জনপ্রিয়।বিখ্যাত ব্রাজিলিয়ান লেখক পাউলো কোয়েলহোর কালজয়ী বই ‘দ্য আলকেমিস্ট’এ জাবিরের কথা উল্লেখ আছে।আমেরিকান কমিক বই ‘শিল্ড’ এর একটি খণ্ডে অষ্টম শতকের শিল্ডের নেতা হিসেবে একটি প্রধান চরিত্রে জাবিরকে চিত্রায়িত করা হয়েছে।আমেরিকান সিটকম ‘বিগ ব্যাং থিওরি’র একটি পর্বে উল্লেখিত হয়েছেন জাবির।ডিসি কমিক্সের ‘ডেমন নাইটস’ পর্বে ‘ইঞ্জিনিয়ার আল জাবর’ রূপে আবির্ভূত হন জাবির। বিশ্বনন্দিত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ও তার একটি ছোটগল্প ‘প্রফেসর শঙ্কু’তে জাবিরের কথা উল্লেখ করেছেন।

কৃত্রিম সালোকসংশ্লেষণ : জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প

বর্তমান বিশ্বে জীবাশ্ম জ্বালানির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের বদৌলতে আমাদের এর বিকল্প ভাবতেই হচ্ছে।বছর কয়েক পর জ্বালানি সংকটে যে পড়তে হবেনা সে সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না।বিশ্বে যে পরিমাণ তেল-গ্যাস-কয়লার মজুদ আছে তা দিয়ে হয়তোবা আমরা আরো একটা শতক পার করতে পারব।কিন্তু তারপর? এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ!!

[•Known oil deposits could run out in just over 53 years.
•Known gas reserves only give us just 52 years left.
•Known coal deposits could be gone in 150 years.]

তবে বিজ্ঞান বসে নেই ।উন্নত বিশ্বের সব বিশ্ববিদ্যালয় নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প খুঁজতে। কেমব্রিজ এর রসায়ন বিভাগের একদল গবেষক তেমনই একটি ডিভাইসের ধারণা দিয়েছেন ।এই ডিভাইসটি সূর্যালোক, কার্বন ডাই অক্সাইড ও পানি থেকে তৈরি করবে কার্বন-ফ্রি জ্বালানী এবং তাও কোনো প্রকার বিদ্যুৎ এর উপস্থিতি ছাড়াই। এই ডিভাইসটিকে বলা যায়, কৃত্তিম সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ, যা কিনা অন্যান্য সকল উদ্ভিদের মত সূর্যালোককে শক্তিতে রূপান্তর করতে পারবে।

প্রকৃতপক্ষে এটি এক ধরনের উন্নত ‘Photosheet’ টেকনোলজির ভিত্তিতে কাজ করে যার মাধ্যমে সূর্যালোক, কার্বন ডাই অক্সাইড ও পানি, অক্সিজেন এবং ফরমিক এসিডে রূপান্তরিত হয়।সহজেই সংরক্ষণযোগ্য ফরমিক এসিডকে সরাসরি বা হাইড্রোজেনে রুপান্তর করেও ব্যবহার করা যায়।

Nature Energy জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণাপত্রে উঠে আসে, কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে ক্লিন ফুয়েল রুপান্তরের পদ্ধতি।ওয়্যারলেস এই ডিভাইসটিতে স্কেলিং এর ব্যবস্থা আছে এবং একে সোলার ফার্মের মত অন্যান্য এনার্জি ফার্মেও ক্লিন ফুয়েল উৎপাদনে ব্যবহার করা যাবে বলে গবেষকরা মনে করছেন।

প্রসঙ্গত, ক্লিন ফুয়েল হলো সেই সব জ্বালানি যারা অপেক্ষাকৃত কম গ্রীনহাউজ গ্যাস উৎপন্ন করে।CNG, LPG র নাম আমরা সবাই শুনেছি, এগুলোও কিন্তু ক্লিন ফুয়েল।

কার্বন নিঃসরণ এবং জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যাপক ব্যবহার হ্রাসকরণের উদ্দেশ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে ক্লিন ফুয়েল তৈরিতে সৌরশক্তির এ ধরনের ব্যবহার নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ।তবে, কোনো রকম উপজাত(বর্জ্য) ছাড়াই এ ধরনের ক্লিন ফুয়েল উৎপাদনকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন গবেষকেরা॥

”কৃত্তিম সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াতে সর্বোচ্চ মাত্রার সিলেক্টিভিটি অর্জন করা আসলে কঠিন একটি ব্যাপার, যাতে আপনি কোনো রকম বর্জ্য ছাড়াই সৌরশক্তির সর্বোচ্চ রূপান্তর ঘটাতে পারেন”, বলেন ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক Dr. Qian Wang.
এর সাথে গ্যাসীয় জ্বালানি সংরক্ষণ এবং উপপজাতকে পৃথকীকরণও জটিল হতে পারে।অধ্যাপক Erwein Reisner জানান, তারা এই জ্বালানীকে তরল অবস্থায় রুপান্তরিত করার চেষ্টা করছেন; কেননা তরল অবস্থায় জ্বালানী সংরক্ষণ ও পরিবহন অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক।
নিঃসন্দেহে বলা যায় এই প্রজেক্ট বাস্তবায়ন হলে জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প খুঁজে পাব আমরা ।বিজ্ঞানের অর্জনের খাতায় যুক্ত হবে আরেকটি নতুন ও সাফল্যমন্ডিত অধ্যায়।

Copyright © 2017 AMC Network Entertainment

ছিলিয়াম
জ্যোতিরসায়ন

ChemFusion
www.chemfusion.net

ব্রেকিং ব্যাড-
রসায়ন কতখানি?

desenho - felipe watanabe / cores - matheus lopes

Mat Lopes

ব্রেকিং ব্যাড (Breaking Bad) হালের জনপ্রিয় একটি টিভি সিরিজ।২০০৮ সালে এই টিভি সিরিজের যাত্রা শুরু। নিও-ওয়েস্টারন ক্রাইম থ্রিলার ধাঁচের এই টিভি সিরিজ বহু বছর তরুনদের মনে সেরা টিভি সিরিজের আসনে আসীন। রোমাঞ্চে ঠাসা,ঘাত-প্রতিঘাত,অপরাধ আর জীবন সংগ্রামের এক বিরহ গাথার মধ্য দিয়ে দর্শক সত্য আর মিথ্যার মাঝেও যে ধূসর একখানি জায়গা আছে তার সাথে পরিচিত হয় এই সিরিজে।

গল্পটা নিউ মেক্সিকো ,আল্বুকারকি অঙ্গরাজ্যের।গল্পের প্রধান চরিত্র ওয়াল্টার হোয়াইট পেশায় একজন রসায়ন শিক্ষক। ছাপোষা,নিরীহ গোছের এই মানুষটার জীবনে ঝড় উঠে।স্টেজ থ্রি লাং ক্যানসার।বাঁচার আশা একদম ক্ষীণ।নিজের চিকিৎসা আর পরিবারের ভবিষ্যৎ নিশ্চিতে ওয়াল্টার তার রসায়নের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে নেমে পড়েন এই ভয়ংকর মাদক ব্যবসায়।মেথাম্ফেটামিন-এক ভয়ংকর প্রাণঘাতী মাদক।

নিজের ক্রূর বুদ্ধির জোরকে কাজে লাগিয়ে গড়ে তোলেন মাদক সাম্রাজ্য যার পরতে পরতে খুন,রাহাজানি আর নিষ্ঠুরতা। শেষ এপিসোডে হোয়াইটের মৃত্যু তাও আমাদের চোখে অশ্রু এনে দেয়-খলনায়ক হয়েও তিনি যেন আমাদের নায়ক। তার অসৎ এবং নীতি বহির্ভূত কাজকর্ম ঢাকা পড়ে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত এক দায়িত্বনিষ্ঠ বাবার অবয়বে।

ব্রেকিং ব্যাডে রসায়নের জ্ঞানের অনেক মজার এবং কৌতূহল উদ্দীপক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।তার মধ্যে কতটুকু মেকি আর কতটুকু রসায়ন অনুমোদন করে? সেই দিকে দৃষ্টিপাত করার আগে কিছুটা ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া আরকি!

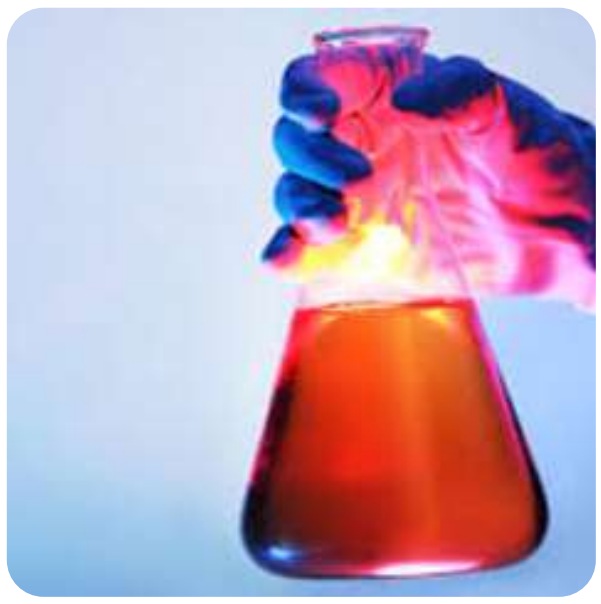

Figure 1 Hydrofluric acid,HF

হাইড্রোফ্লুরিক এসিড
এই সিরিজের এক পর্বে এমিলিওর মৃতদেহ ধ্বংসের জন্য হাইড্রোফ্লুরিক এসিড বা HF বেছে নেয়।

হাইড্রোফ্লুরিক এসিড কি মৃতদেহ ধ্বংস করতে সক্ষম?

হাইড্রোফ্লুরিক এসিড একটি ক্ষয়কারক, অম্লজাতীয় পদার্থ ।অনার্দ্র হাইড্রোজেন ফ্লুরাইড গ্যাস এবং জলীয় হাইড্রোফ্লুরিক এসিড হিসেবে একে পাওয়া যায়।ফ্লুরস্পারের (CaF_2) সাথে সালফিউরিক এসিডে,H_2SO_4 বিক্রিয়ার উৎপন্ন হয় এই এসিড।বিক্রিয়াটি তাপহারি।

$$CaF2 + H2SO4 = 2HF + CaSO4$$

হাইড্রোফ্লুরিক এসিড ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে অ্যালুমিনিয়াম প্রোডাকশন এবং ইউরেনিয়াম প্রসেসিং।এছাড়াও ফ্লুরো কার্বন প্রস্তুতে এবং রেফ্রিজেরান্ট হিসাবে এর ব্যবহার।কিন্তু হাইড্রোফ্লুরিক এসিড কি মৃতদেহ ধ্বংস করতে সক্ষম?

মৃতদেহ ধ্বংসে এই এসিডের ব্যবহার তেমন নেই।ক্ষয়কারক গুন থাকায় এই এসিড কাচ বা সিলিকার ক্ষতি করতে পারে এটা প্রমাণিত।এই জন্য কাচের কোন পাত্রে এই এসিড সংরক্ষণ করা হয় না- করা হয় টেফলন বা প্লাস্টিকে যা এর ক্ষয় সহ্য করতে সক্ষম।

মৃতদেহ ধ্বংসে মূলত ব্যবহৃত হয় কস্টিক সোডা (NaOH) বা কস্টিক পটাশ (KOH) এর ক্ষারীয় দ্রবণ যা লাই (Lye) নামে পরিচিত।মেক্সিকোর বিভিন্ন অপরাধ সংঘটনের মধ্যে এই পদ্ধতি অবলম্বনের প্রচলন রয়েছে।ফুটন্ত ক্ষারের দ্রবণে মৃতদেহ ধ্বংসে সময় লাগে ৩৬ ঘন্টার মতো।এই প্রক্রিয়ায় উপজাত হিসেবে প্রচুর বিষাক্ত গ্যাস তৈরি হবে।ফিউমিং হুডের ব্যবস্থা না থাকলে তা প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে ।কস্টিক সোডা বা কস্টিক পটাশ তীব্র ক্ষারধর্মী সেই তুলনায় হাইড্রোফ্লুরিক এসিড এর অম্লধর্ম নিতান্ত।এটি দুর্বল এসিড-জলীয় দ্রবণে সম্পূর্ণ বিশ্লেষিত হয় না।এর ক্ষয়কারক ধর্মের জন্য ফ্লোরাইডের উপস্থিতি দায়ী।এটি মূলত টিস্যু ক্ষয়কারক এবং ডিক্যালসিফায়ার।ত্বকের দহন , শ্বাসরোধী এবং বিভিন্ন অঙ্গের কাজকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলেও মৃতদেহ ধ্বংসের ক্ষেত্রে এই এসিডের ভূমিকা প্রমাণসাপেক্ষ।

সালফিউরিক এসিড ব্যবহারে মৃতদেহ ধ্বংসের দৃষ্টান্ত রয়েছে-Mrs. Durand Deacon এর হত্যাকান্ডে। যেখানে John Haigh একজন দাগি আসামি এসিড বাথে তার শিকারের মৃতদেহ ধ্বংস করেন।
তবে সিরিজে দেখানো বাথ ট্যাব এবং ফ্লোরের যে ক্ষতি তা যুক্তিযুক্ত যেহেতু হাইড্রোফ্লুরিক এসিড একটি ক্ষয়কারক উপাদান এই জন্য ওয়াল্টার জেসিকে প্লাস্টিকের পাত্রে মৃতদেহ ধ্বংসের কাজটি করতে উপদেশ দিয়েছিল।
হাইড্রোফ্লুরিক এসিড প্লাস্টিকের ক্ষতি করতে না পারলেও সিরামিকের বেশ ক্ষতিসাধন করে।

মার্কারি ফালমিনেট

এই সিরিজের এক এপিসোডে রয়েছে মার্কারি ফালমিনেটের ব্যবহার ।ওয়াল্টার হোয়াইট টুকো সালমাঙ্কার ডেরা মার্কারি ফালমিনেটের বিস্ফোরণের মাধ্যমে উড়িয়ে দেয়।

মার্কারি ফালমিনেট কি? সত্যি কি তা বিস্ফোরক হিসাবে ব্যবহার করা যায়?

Mercury (II) Fulminate একটি বিস্ফোরক দ্রব্য।রাসায়নিক সংকেত Hg(CNO)2 আবিষ্কার ১৮০০ সালে,Edward Howard নামের একজন বিজ্ঞানীর হাতে।এই রাসায়নিক দ্রব্যের ক্রিস্টালের গঠন আবিষ্কার হয় ২০০৭ সালে।নাইট্রিক এসিড ,HNO3 এবং ইথানলের,CH3CH2OH বিক্রিয়ায় মার্কারি ফালমিনেট প্রস্তুত হয়।

$$Hg + HNO_3 = Hg(NO_3)_2 + 2NO + H_2O$$

Edward Howard যখন এই দ্রব্য টি আবিষ্কার করেন হাতুড়ির আঘাতে দ্রব্যটি বিস্ফোরিত হয় সেই থেকে দ্রব্যের নামকরণ হয় ফালমিনেট।

অস্থায়ি,দাহ্য এবং বিস্ফোরক এই উপাদান মূলত বিভিন্ন বিস্ফোরণের কাজে ব্লাস্টিং কাপে ট্রিগার হিসাবে ব্যবহৃত হয় তবে বিপজ্জনক বলে এখন লেড আজাইড,Pb(N3)2 ব্যবহৃত হয়।১০০০ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এর বিয়োজন শুরু হয় তবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে বিয়োজন হার বাড়তে থাকে ।কোন শক বা দ্রুত বেগে আঘাত থেকেও এই বিক্রিয়ার সূত্রপাত হতে পারে।মার্কারি ফালমিনেট বিয়োজিত হয়ে উৎপন্ন হয় নাইট্রোজেন (N_2), কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2) সাথে বিষাক্ত মেটালিক মার্কারি বাষ্প (Hg)।

$$4Hg(CNO)_2 = 2CO_2 + N_2 + HgO + 3Hg(OCN)CN$$

$$Hg(CNO)_2 = 2CO + N_2 + Hg$$

$$Hg(CNO)_2 = Hg(OCN)_2$$

$$2Hg(CNO)_2 = 2CO_2 + Hg + N_2$$

সিরিজে যেমনটি দেখানো হয়েছে একদানা ক্রিস্টাল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ওয়াল্টার একেবারে সুস্থ অবস্থায় মাদক সম্রাটের ডেরা থেকে প্রস্থান করে তেমন টা কি সম্ভব? এক দানা ক্রিস্টাল বিস্ফোরণ ঘটাতে হলে তা স্বাভাবিক ভাবেই অপরাপর ক্রিস্টালগুলোতে বিস্ফোরণ সৃষ্টি করবে এতে করে ওই রুমে একটি প্রানীরও বেঁচে থাকার কথা না। আবার এই বিক্রিয়ায় যে বিষাক্ত মার্কারি বাষ্পের নির্গমন হয় এতে করেও কারো বেঁচে থাকার কথা না।

তার থেকেও বড় কথা ওত বড় ক্রিস্টাল দানা (যেমনটা দেখানো হয়েছে) অনেক বেশি অস্থায়ী ফলে প্রস্তুত করাও সম্ভব না।

রাইসিন

রাইসিন খুব সম্ভবত এই সিরিজের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর রাসায়নিক দ্রব্য ।বেশ কয়েক ক্ষেত্রে আমাদের সিরিজের খলনায়ক তার ক্রূর রসায়নের বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে এই বিষের মাধ্যমে শত্রুপক্ষের অনেককে কাবু করতে সক্ষম হন । ব্রকের অসুস্থতা থেকে লিডিয়ার মৃত্যু সবক্ষেত্রেই রয়েছে এই বিষের প্রয়োগ।

কতটা ভয়ানক এই রাইসিন নাকি আদতে কিছুই না?

Ricin, কাস্টর জাতীয় উদ্ভিদ Ricinus Communis থেকে আহরিত একটি খুবই মারাত্মক বিষাক্ত প্রোটিন।এটি মূলত কীটনাশক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।কাস্টর বীজ সেবনে বাচ্চাদের স্বাস্থ্যহানি হতে পারে পূর্ণ বয়স্কদের ক্ষেত্রে ২০ গ্রামের মতো খেলেই ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।তবে পাউডার ফর্মে রাইসিন খুবি বিষাক্ত।

রাইসিন দেহের ডিএনএ এর ঘাটনিক উপাদান আডেনিনের কর্মক্ষমতা নষ্ট করে দেয় অ্যাডেনিন দেহের প্রোটিন সংশ্লেষণে ভুমিকা রাখে এর অনুপস্থিতিতে প্রোটিন সংশ্লেষণ বাধাগ্রস্থ হয় ফলে তান্ত্রিক গোলযোগ দেখা যায়।

বাস্তবেও রাইসিন প্রয়োগে হত্যার চেষ্টার নজির কিন্তু কম নেই ।মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সহ তার প্রশাসনের কয়েকজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা হত্যা চেষ্টায় রাইসিন ব্যবহৃত হয় তবে সেটি ব্যর্থ করে দেয় মার্কিন নিরাপত্তা বাহিনী। Georgi Markov নামের একজন বুলগেরীয় হত্যার পেছনে এই বিষের ব্যবহার হয়েছিল বলে প্রমাণ রয়েছে। ঠিক সময়ে চিকিৎসা নিলে রাইসিনের বিষক্রিয়া থেকে বেচে থাকা সম্ভব।

থারমাইট

এবার আসি থারমাইটের গল্পে।ক্রিস্টাল মেথের অন্যতম কাচামাল মিথাইল এমিন,CH3NH2 ।আর এই কাঁচামাল সংরক্ষিত ছিল একটি গুদামে যা কিনা লোহার লকের দরজা দ্বারা সুরক্ষিত আর এই তালা ভাঙতে আমাদের রসায়নের শিক্ষক ব্যবহার করলেন থারমাইট।

থারমাইট ,Thermite ধাতব চূর্ণ এবং ধাতব অক্সাইডের এর একটি মিশ্রণ যা কিনা উত্তপ্ত অবস্থায় বেশ তাপশক্তি উৎপাদনে সক্ষম থারমাইটের ব্যবহার রয়েছে ধাতুর ওয়েল্ডিঙে।

সিরিজে থারমাইট প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়েছিল আইরন অক্সাইড,Fe2O3 এবং অ্যালুমিনিয়াম,Al এই বিক্রিয়ায় উপজাত হিসাবে তৈরি হয় গলিত লোহা সেই সাথে প্রচুর তাপশক্তি প্রায় ২৫০০০ সেলসিয়াস তাপমাত্রা যা লোহার লক কেন পুরা দরজায় আগুন ধরিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ।

$$Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe$$

এই বিক্রিয়ায় যে আলো ও তাপশক্তি উৎপন্ন হয় তাতে জেসি এবং ওয়াল্টার দুইজনেরই স্বাস্থ্যগত ক্ষতি হবার কথা কিন্তু তেমন টা ঘটতে দেখা যায় না।

ফসফিন গ্যাস

সিরিজের এক পর্যায়ে দেখা যায় ওয়াল্টার তার আরভি ভ্যানে ফসফিন গ্যাসের,PH_3 বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দুই জন হন্তারক থেকে নিজেকে রক্ষা করে।

ফসফিন কি পারে বিস্ফোরণ ঘটাতে?

সিরিজে দেখানো রেড ফসফরাস,P_4 গরম পানিতে ডুবিয়ে আর্দ্র বিশ্লেষণ করে ফসফিন গ্যাস,PH_3 প্রস্তুত করা হয় রেড ফসফরাস গরম পানিতে যথেষ্ট আর্দ্র বিশ্লেষিত হয় না ফলে এই উপায়ে ফসফিন গ্যাস প্রস্তুত সম্ভব হবে না অন্তত বিস্ফোরণ ঘটানো সম্ভব না।

ধাতব ফসফাইড যেমন ক্যালসিয়াম ফসফাইডের আর্দ্র বিশেষণে বিস্ফোরণ সহ ফসফিন গ্যাস প্রস্তুত সম্ভব।

$$Ca_3P_2 + 6H_2O = 3Ca(OH)_2 + 2PH_3$$

ফসফিন গ্যাসের উদগিরনের ফলে এমিলিও এবং ক্রেজি-৮ কে অবচেতণ হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়।ফসফিন বিষাক্ত গ্যাস।শ্বাস প্রশ্বাসে ব্যাঘাত ঘটায়।

ব্লুক্রিস্টাল মেথ

Figure 9 Blue Crystal Meth

ওয়াল্টারের সিগনেচার ডিশ ব্লুক্রিস্টাল মেথ।রসায়ন কি বলে, মেথ কি নীল হতে পারে?

উত্তর হল না।সিরিজে দুই উপায়ে ক্রিস্টাল মেথের সংশ্লেষণ দেখানো হয় ।একটি হল সিউডো এফিড্রিন,pseudoephidrin থেকে – এটি সুডাফেদ নামক ঠান্ডা কাশির জন্য একটি ঔষধ এর উপর নির্ভর করে ওয়াল্টার শুরুর দিকে তার মেথ সাম্রাজ্য গড়ে তুললেও বাণিজ্যিক ভাবে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন আরও ভালো এবং সাশ্রয়ী কাচামাল-মিথাইল এমিন ,CH3NH2 ওয়াল্টারের কথিত ৯৯.১% বিশুদ্ধ ক্রিস্টাল মেথের বর্ণ নীল হওয়া সম্ভব না ।এই সিরিজের সাফল্যের পর মেক্সিকোর ড্রাগ কারটেলগুলো অবশ্য নীল রঞ্জক দিয়ে ব্লুক্রিস্টাল মেথের বিক্রি শুরু করেছিল!!

টিভি সিরিজের মুখ্য উদ্দেশ্য দর্শককে আমোদিত করা এবং কৌতূহল উদ্রেক করা।পাঠ্যপুস্তকের রসায়নের জ্ঞানকে টিভিতে তুলে আনা নয়।এই জন্য এটি ফিকশন বা কল্পনা- বাস্তব নয়।তবে হ্যাঁ,রসায়নের অনেক দিক চটকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এখানে।যার জন্য এই সিরিজের ডিরেক্টর বিশেষ ধন্যবাদের দাবি রাখেন।

রসায়ন কাঠখোট্টা,বেজায় নিরস ।এই মরুময়তার মধ্যেও প্রানের সঞ্চার করেছে এই টিভি সিরিজ ।

সিরিজটি দেখে না থাকলে এবং রসায়নের ছাত্র হয়ে থাকলে লেখাটি পড়ে শুরু করে দিন না !!

তথ্যসূত্রঃ

BBC ,Fandom, RSC

T.M. Nafiz Imran Dipto
Applied Chemistry & Chemical Engineering
University of Dhaka

ভিডিও কলে পরিবেশ দূষণ

শিরোনাম দেখে মনে হতেই পারে আমি নিছক মজা করছি ।ভিডিও কলের সাথে পরিবেশের সম্পর্ক!! ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়।কিন্তু বিজ্ঞান বলছে অন্য কথা।

বিজ্ঞানীদের মতে, মহামারীর কারণে দেশে দেশে লকডাউন, যানবাহন চলাচল সীমিত, শিল্পকারখানাও চলছে না আগের গতিতে; তাই ২০২০ সালে বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণ রেকর্ড পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে ঠিকই কিন্তু ইন্টারনেটের অতি ব্যবহারে বেড়েছে কার্বন নির্গমনের হার।

এই মহামারীর সময়ে স্কুল-কলেজ-অফিসের কাজগুলো যে কেউ বাসায় বসেই করতে পারছে, এতে করে সুবিধে হলেও হিতে বিপরীত হয়েছে পরিবেশের জন্য।
পৃথিবী জুড়ে ভিডিও কনফারেন্সিং বা স্ট্রিমিংয়ে মাত্র এক ঘন্টায় 150-1,000 গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হয় (একটি গাড়ি থেকে পোড়ানো এক গ্যালন থেকে প্রায় 8,887 গ্রাম নির্গত হয়।এতে অবশ্য 2-12 লিটার পানির প্রয়োজন হয়)।তবে আপনার ডিভাইসের ক্যামেরা বন্ধ রেখে এই কার্বন ফুটপ্রিন্ট 96% হ্রাস করা সম্ভব।নেটফ্লিক্স বা হুলুর মতো অ্যাপ্লিকেশনগুলি ব্যবহার করার সময় হাই ডেফিনেশন এর চেয়ে স্ট্যান্ডার্ড ডেফিনেশন এ স্ট্রিমিং করে কার্বন ফুটপ্রিন্ট 86% হ্রাস করা সম্ভব।

(Carbon Footprint: A carbon footprint is the amount of greenhouse gases–primarily carbon dioxide–released into the atmosphere by a particular human activity.)

পার্ডু বিশ্ববিদ্যালয়, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় এবং ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির গবেষকগণ দ্বারা পরিচালিত এই গবেষণাটি কার্বন ফুটপ্রিন্টের পাশাপাশি ইন্টারনেট অবকাঠামোর সাথে যুক্ত বিভিন্ন উপাদান এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছে।ফলাফলগুলি “রিসোর্স, কনজারভেশন এবং রিসাইক্লিং” জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

পার্ডু বিশ্ববিদ্যালয় এর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক রোশনাক রোশী নাটোগী বলেন,
“যদি আপনি কেবলমাত্র এক ধরণের ফুটপ্রিন্টের দিকে মনোনিবেশ করেন তবে আপনি অন্য অনেক উপাদান সম্পর্কে জানতে পারবেন না যা পরিবেশ দূষণ এর জন্য দায়ী।”

বেশ কয়েকটি দেশে মার্চ থেকে ইন্টারনেট ট্রাফিক কমপক্ষে ২০% বৃদ্ধি পেয়েছে।সমীক্ষায় দেখা গেছে, এই প্রবণতা যদি ২০২১ সালের শেষ অবধি অব্যাহত থাকে তবে ইন্টারনেটের বর্ধিত ব্যবহারের জন্য নির্গত কার্বন দূরীভূত করতে প্রায় ৭১,৬০০ বর্গমাইল বনের দরকার পড়বে- যা ইন্ডিয়ানার জমির দ্বিগুণ!

ডাটা ট্রান্সমিশন আর প্রসেসিং এর জন্য যে বাড়তি বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয়, আর সে বিদ্যুৎ উৎপাদনে যতটুকু পানি প্রয়োজন তা দিয়ে খুব সহজেই ৩০০০০০ অলিম্পিকের সুইমিং পুল তৈরি করে ফেলা সম্ভব।এবং ল্যান্ড ফুটপ্রিন্ট এর পরিমাণ হবে লস অ্যাঞ্জেলেস এর আকারের সমান।

দলটি ইউটিউব, জুম, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, টিকটকসহ অন্যান্য ১২টি প্ল্যাটফর্মের পাশাপাশি অনলাইন গেমিং এবং ওয়েব সার্ফিংয়ে ব্যবহৃত প্রতি গিগাবাইটের ডেটার জন্য সম্ভাব্য কার্বন, ওয়াটার এবং ল্যান্ড ফুটপ্রিন্ট অনুমান করে।

সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হলো, অ্যাপ্লিকেশনগুলোতে যত বেশি ভিডিও ব্যবহৃত হবে তত বেশি ফুটপ্রিন্ট দৃশ্যমান হবে।

কারণ ভিডিও কলের জন্য ডেটা প্রসেসিংয়ে তুলনামূলক বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়, এবং বিদ্যুতের উৎপাদনে কার্বন, ওয়াটার এবং ল্যান্ড ফুটপ্রিন্ট থাকে।

COVID-19 লকডাউনের আগেই ইন্টারনেট ব্যবহারজনিত কার্বন ফুটপ্রিন্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল, যা বিশ্বব্যাপী গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের প্রায় 3.7% ছিল।এই গবেষণা দলের প্রধান, একই সাথে ইয়েল ম্যাকমিলান সেন্টারের প্রধান মাদানী বলেছেন, পরিবেশের উপর ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রভাবে বরাবরই ওয়াটার ও ল্যান্ড ফুটপ্রিন্টকে উপেক্ষা করে যাওয়া হয়েছে।

মাদানী মূলত এই ফুটপ্রিন্টগুলো কীভাবে বাড়তি ইন্টারনেট ট্র্যাফিকের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে তা খতিয়ে দেখতে নাটেগির গবেষক দলের সাথে একত্রিত হন।দলটি ব্রাজিল, চীন, ফ্রান্স, জার্মানি, ভারত, ইরান, জাপান, মেক্সিকো, পাকিস্তান, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আমেরিকায় তথ্য সংগ্রহ করে।

গবেষকরা জানিয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইন্টারনেট ডেটা প্রক্রিয়াকরণ ও প্রেরণে কার্বন ফুটপ্রিন্ট এর মাত্রা সারা বিশ্বের চাইতে ৯% বেশি।তবে ওয়াটার ও ল্যান্ড ফুটপ্রিন্ট যথাক্রমে 45% এবং 58% কম থাকে।

অন্যদিকে নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ব্যবহারে বিশ্বে শীর্ষস্থানে থাকা জার্মানির কার্বন ফুটপ্রিন্ট তুলনামূলক কম হলেও, এর ওয়াটার আর ল্যান্ড ফুটপ্রিন্ট অনেক বেশি (২০৪% বেশি)।

সবশেষে একটাই কথা, ভিডিও কল কিংবা ভিডিও শেয়ারিং শুধুমাত্র বিদ্যুৎ এর অপচয়ই না, গ্রিনহাউস গ্যাস এর নির্গমনসহ আরো নানা ধরনের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার কারণ।

কি-ওয়ার্ড : কার্বন ফুটপ্রিন্ট, ওয়াটার ফুটপ্রিন্ট, ল্যান্ড ফুটপ্রিন্ট

ChemFusion
www.chemfusion.net

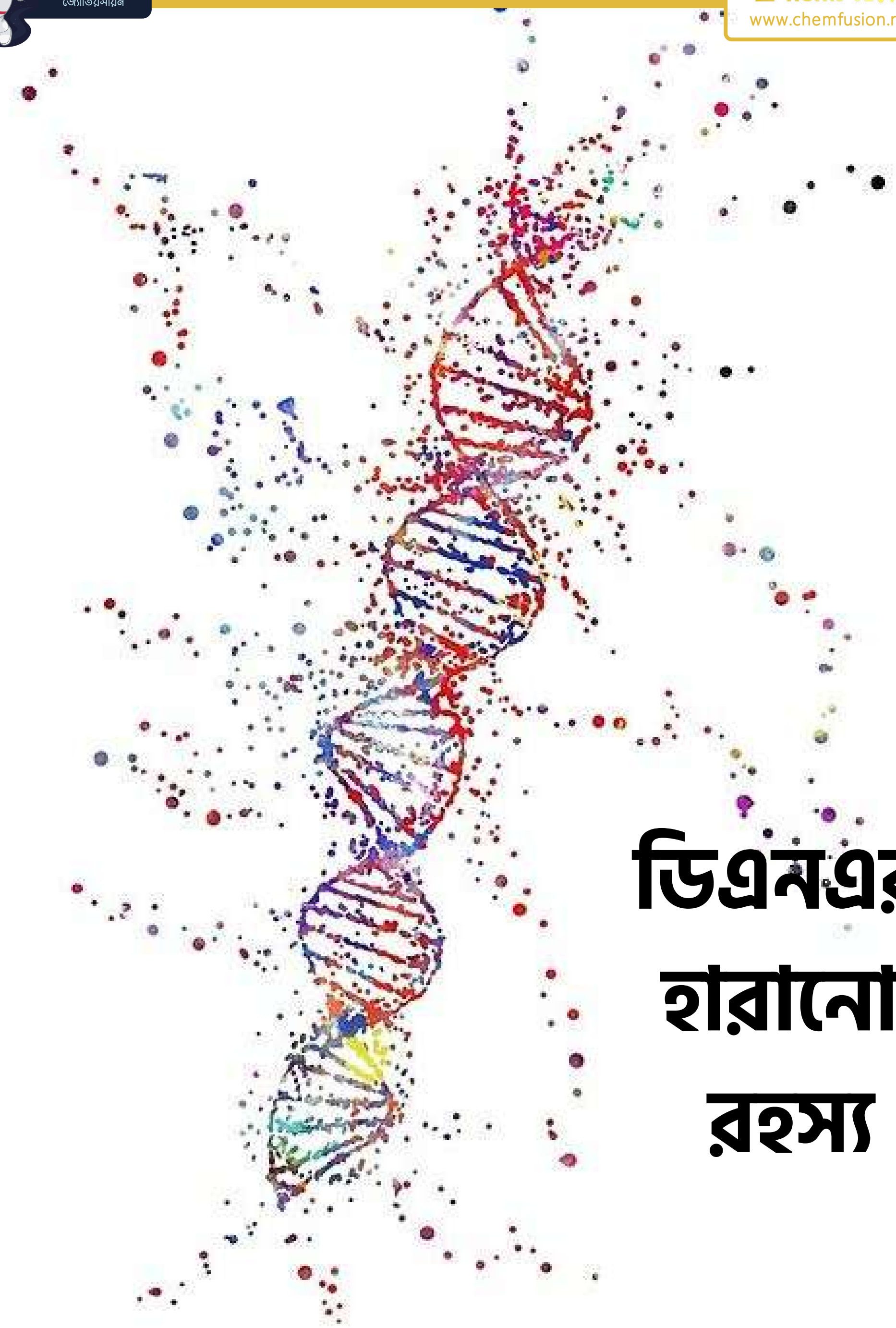

ডিএনএর হারানো রহস্য

গুরুত্বপূর্ণ এই বায়োমলিকিউল এর আবিষ্কারের কীর্তি অনেকেই দিয়ে থাকেন জেমস ওয়াটসন এবং ফ্রানসিস ক্রিককে।রসায়নের ইতিহাস পরিক্রমায় ডিএনএ উদঘাটনের কীর্তি গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো ঘটনা কেন্দ্রিক , হেলিক্সের মতোই এর আবিষ্কারের রহস্যও সময়ের সাথে সাথে নিয়েছে বিভিন্ন বাক ; শেষ পরিণতি আজকের সর্বজনস্বীকৃত ডাবল হেলিক্স কাঠামো।

শুরুটা হয়েছিল আরও ১০০ বছর আগে সুইস কেমিস্ট ফ্রেডরিখ মিশারের কাজের সূত্র ধরে মিশারের প্রথমবারের মতো ডিএনএ পর্যবেক্ষণ ছিল বায়োলজিক্যাল সাইন্সের জন্য অনেকটাই আশীর্বাদস্বরূপ যা পরবর্তীতে ফোবাস লিভেন এবং এরুইন শারগফের মতো সাইন্টিস্টদের ডিএনএ তথা নিউক্লিক এসিডের উপর গবেষণা কর্ম সাধনে চমৎকার প্রেরণার উৎসরুপে কাজ করেছে ।

ফ্রেডরিখ মিশার যে বছর শ্বেত রক্ত কণিকায় প্রথম ডিএনএ পর্যবেক্ষণ করলেন, সে সময়টাকে এখনো জেনেটিক রিসার্চের ক্ষেত্রে ‘Landmark’ হিসেবে গণ্য করা হয়।তবে মিশারের এই কাজের মাধ্যমে এই বায়োমলিকিউল কিন্তু প্রথমেই ডিএনএ নামে পরিচিত হয় নি, এর নাম মিশার দিয়েছিলেন নিউক্লিন; নিউক্লিনে এসিড সদৃশ ধর্ম দেখতে পান অল্টম্যান, যার দরুণ পরবর্তীতে এর নাম হয়ে যায় নিউক্লিক এসিড শ্বেত রক্ত কণিকা বা লিউকোসাইটের প্রোটিন বিশ্লেষণ ছিল মিশারের গবেষণা কাজের মূল উদ্দেশ্য; ডিএনএ তথা নিউক্লিনের উপস্থিতি ছিল তাই অনেকটাই অপ্রত্যাশিত।

কাজের সুবিধার্থে লিউকোসাইট এর খোঁজে সংগ্রহও করে ফেললেন রোগীর ক্ষত স্থানে ব্যবহৃত ব্যান্ডেজ আর পুজ সহ গজ।এগুলো থেকে সংগ্রহ করা লিউকোসাইট এক্সট্রাক্টের বিশ্লেষণে প্রোটিন অণুর উপস্থিতি মিশার পেয়েছিলেন ঠিকই।কিন্তু একটি বিষয় তাকে বেশ ভাবিয়ে তুললো- লিউকোসাইটিক নিউক্লিয়াসে এক ধরনের পদার্থ দেখা যাচ্ছে যার ধর্ম কোনো সাধারণ প্রোটিনের মতো তো নয়ই বরং এতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণের ফসফরাস কনটেন্ট এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।প্রচলিত উপায়ে প্রোটিওলাইসিস করার কয়েকবার চেষ্টাও করলেন মিশার- না, তাও হলো না!!বারংবার চেষ্টার পর ব্যর্থতায় মগ্ন না হয়ে মিশার রাত দিন কাজ করতে থাকলেন।অবশ্য ব্যাপারটাকে একদিক থেকে অতোটা উপেক্ষাও করতে পারলেন না, খানিকটা আত্মবিশ্বাস থেকেই তার মনে হলো কোনো নতুন জৈব অণুর সন্ধান তিনি পেতে চলেছেন।রিসার্চ ফাইন্ডিংস এর গুরুত্ব অনুধাবন করে তিনি লিখেছিলেন,’আমার কাছে মনে হয়, কোষে নিউক্লিন নামক এক ধরণের অণুর উপস্থিতি বেশ সক্রিয় যাদের মধ্যে ফসফরাস কনটেন্ট এর সামান্য ব্যত্যয় থাকতে পারে তবে অণুগুলোকে প্রোটিন অণুর সমতুল্যও বলা যায়।

মিশারের নিউক্লিন তথা নিউক্লিক এসিডের আবিষ্কারের গুরুত্ব তৎকালীন সংশ্লিষ্ট মহলে আশাজনকভাবে অনুধাবিত না হলেও পরবর্তীতে বড় বিজ্ঞানী মহলে সমাদৃত হতে কেটে যায় ৫০ বছরেরও বেশি।এ প্রসংগে এরুইন শারগফের এক প্রবন্ধ বিশ্লেষণে দেখা যায়, শারগফ উনিশ শতকের বিজ্ঞানের ইতিহাসে নিউক্লিক এসিড গবেষণায় চার্লস ডারউইন, থমাস হাক্সলের মত খ্যাতিমান বিজ্ঞানীদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করলেও ফ্রেডরিখ মিশারের কথা আকস্মিকভাবে একবারও উল্লেখ করেন নি।

বিশ শতকের কাছাকাছি নিউক্লিনের রাসায়নিক প্রকৃতি নিয়ে নতুন ধারায় কাজ শুরু করেন আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী , ততোদিনে মিশারের গবেষণার কৃতিত্ব প্রায় ম্রিয়মাণ হয়ে গেছে।এদের মধ্যে অগ্রগামী রাশিয়ান বায়োকেমিস্ট ফোবাস লিভেন, বায়োলজিক্যাল মলিকিউলসের উপর যিনি ওই সময় ৭০০ রও অধিক গবেষণা পত্র প্রকাশ করেছিলেন।একক নিউক্লিওটাইড অণুর ক্রম শনাক্তকরণে, RNA-DNA র মধ্যে পার্থক্যকরণে এবং এসব অণুতে রাইবোজ ও ডিঅক্সিরাইবোজের উপস্থিতি শনাক্তকরণে তিনি ছিলেন অন্যদের জন্য পথিকৃৎ।

লিভেনের আগে সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের এটা জানা ছিল না যে DNA র প্রতিটি নিউক্লিওটাইড একটা আরেকটার সাথে ত্রিমাত্রিক স্থানে কীভাবে সন্নিবেশিত থাকে।এতো অধিক সংখ্যক নিউক্লিওটাইড গ্রুপ যারা কেবল নিজেদের মধ্যে বন্ড করতে পারে এক্ষেত্রে তাদের সজ্জিত হবার অসংখ্য পন্থা থাকাটাই স্বাভাবিক- এরূপ অনুমানের ভিত্তিতে অনেকেই অনেক রকম মডেল প্রস্তাব করলেও শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি লাভ করে লিভেনের পলিনিউক্লিওটাইড মডেলটিই।ইস্টের নিউক্লিক এসিডের উপর কয়েকশো পরীক্ষা চালিয়ে লিভেন যে মতবাদ প্রদান করেন সেটা ছিল অনেকটা এরকম যে, নিউক্লিক এসিডগুলো অসংখ্য নিউক্লিওটাইড অণুর সমন্বয়ে তৈরি এবং প্রতিটা নিউক্লিওটাইড অণু আবার নাইট্রোজেন বেইস-শ্যুগার-ফসফেট গ্রুপ এই ট্রায়োর সমন্বয়ে তৈরি ১৯ শতকের শুরুতে প্রস্তাবিত এই মডেলে লিভেন উল্লেখ করেন যে, নতুন তত্ত্ব বা প্রমাণাদির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে প্রচলিত নিউক্লিক এসিডের গঠন কাঠামোয় ভিন্নতা আগামী গবেষণাগুলোতে স্পষ্ট হতে পারে , তবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই যে নিউক্লিক এসিডগুলো একেকটা পলিনিউক্লিওটাইড।

গুরুত্বপূর্ণ আরও একটি গবেষণা এ সময় চলছিল পলিনিউক্লিওটাইড চেইনে নিউক্লিওটাইডগুলোর ক্রম শনাক্তকরণের উপর।একেবারে আলাদা না হলেও, লিভেন তার মডেলে টেট্রানিউক্লিওটাইড চেইনে নিউক্লিওটাইডের একটা সুনির্দিষ্ট ক্রম নিয়ে কথা বলেছিলেন যেটাকে এখনকার রীতিতে সাংকেতিকভাবে প্রকাশ করলে দাঁড়াবে, G-C-T-A-G-C-T-A.... ।লিভেনের নিউক্লিওটাইড ক্রমের সুনির্দিষ্টতা অতিসাধারণ হওয়ায় কয়েকজন বিজ্ঞানী এটাও ধারণা করেন যে নিউক্লিওটাইডের এই ক্রম কোনো নির্দিষ্ট সিকোয়েন্স অনুসরণ করে না বরং এদের সজ্জিত হওয়া সম্ভব আরও ভিন্ন কয়েকটা উপায়ে লিভেনের পলিনিউক্লিওটাইড মডেলকে সমর্থন জানিয়ে ডিএনএর আরও বিস্তারিত ও সূক্ষ্ম বর্ণনা এবার দিতে চেষ্টা করেন এরুইন শারগফ, বলা যায় শারগফের এই কাজ ছিল ওয়াটসন-ক্রিকের গবেষণার জন্য অনেকটাই ক্যাটালিস্টের মতো।শারগফের এরূপ প্রেরণার সূত্র যে তবে কেবলই লিভেনের রিসার্চ ফাইন্ডিংস, এমনটা সরাসরি বলা হয়ত ঠিক হবে না।

ChemFusion
www.chemfusion.net

তৎকালীন সময়ে রকফিলার ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক অস্টওয়াল্ড এভারি তার এক রিসার্চ পেপারে বলেছিলেন,বংশগতির অন্যতম উপাদান জিনগুলো ডিএনএ র সমন্বয়ে তৈরি, গঠনগত একক হিসেবে ডিএনএ র সূক্ষ্মগঠন ও বিন্যাস উন্মোচিত হলে অদূর ভবিষ্যতে জেনেটিক্স এ কত বড় ধারণাগত পরিবর্তন যে ঘটতে চলেছে- তার গুরুত্ব শারগফ এখান থেকেই হয়তবা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।নিউক্লিক এসিড নিয়ে কাজ করতে গিয়ে শারগফের টিম বিভিন্ন প্রাণি প্রজাতির ডিএনএ সংগ্রহ করে তাদের মধ্যে তুলনামূলক কাঠামোগত শ্রেণিভেদের চেষ্টা করে।অবশেষে ১৯৫০ সালের দিকে তারা দুই ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হনঃ প্রথমত, ডি এন এ অণুতে নিউক্লিওটাইডগুলোর সজ্জা প্রজাতিভেদে পরিবর্তনশীল।দ্বিতীয়ত, নিউক্লিওটাইড ক্রমের ভিন্নতা সত্ত্বেও সব ধরনের ডিএনএ অণুতে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলতে তারা বুঝিয়েছিলেন যে, সব ধরনের ডিএনএ অণুতেই এডিনিন ও থায়ামিন,গুয়ানিন ও সাইটোসিন বেইস জোড়ার পরিমাণ সমতুল্য।এমনকি পিউরিন বেইস (এডিনিন ও গুয়ানিন) এবং পাইরিমিডিন বেইস (সাইটোসিন ও থায়ামিন) এর মোট পরিমাণও প্রায় কাছাকাছি। শারগফের দ্বিতীয় সিদ্ধান্তকেই মূলত এখন আমরা শারগফের রুল হিসেবে জানি।তবে পিউরিন ও পাইরিমিডিন বেইস জোড়ের আনুপাতিক সম্পর্কের যে ব্যাখ্যা শারগফ দিতে পারেন নি, তা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয় রোজালিন্ড ফ্রাংকলিন-মরিস উইলকিনসনের এক্স রে ক্রিস্টালোগ্রাফিক ওয়ার্ক আর ওয়াটসন ও ক্রিকের পাজেল মডেল এপ্রোচের মধ্য দিয়ে ।

১৯৫১ সাল, ডেনমার্কের ন্যাপলিসের এক কনফারেন্সে উইলকিনসন ডিএনএ স্ট্রাকচারের উপর করা এক্স রে ক্রিস্টালোগ্রাফিক ফটোগ্রাফ প্রদর্শন করেছিলেন, Photo 51 নামে খ্যাত এ ফটোগ্রাফটি ছিল ফ্রাংকলিনের নেচারে প্রকাশিত আর্টিকেল থেকে নেয়া।ওই কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন তরুণ গবেষক ওয়াটসনও, উইলকিনসনের প্রদর্শিত ক্রিস্টালোগ্রাফিক ইমেইজ ওয়াটসনকে অনেকটাই দ্বিধান্বিত করে ।ছবিতে ডি এন এ ডাবল হেলিক্স মডেলের প্রত্যক্ষ নিদর্শন না থাকলেও এতে কিছু জোরালো ক্লু দেখলেন ওয়াটসন, যদিও ডিএনএ সুত্রক সংখ্যা, অণুর রাসায়নিক গঠন কাঠামোজনিত সূক্ষ্ম পরিমাপের অনেক কিছুই ছবিতে স্পষ্ট বোঝার উপায় ছিল না ক্যামব্রিজের ক্যাভেন্ডিস ল্যাবরেটরিতে এ সময় কাজ চলছিল ক্রিস্টালোগ্রাফি ভিত্তিক আরও কিছু প্রজেক্টের।এদের মধ্যে একটি ছিল হিমোগ্লোবিন ও মায়োগ্লোবিন স্টাডি নিয়ে, ম্যাক্স পেরুটয আর জন কেনড্রিউর সাথে সেখানে কাজ করছিলেন ফ্রানসিস ক্রিকও।প্রজেক্টের থিসিস পেপার লিখবার সময়ই ক্রিকের সাথে দেখা ওয়াটসনের।সমসাময়িককালে কেমিক্যাল বন্ডিং নিয়ে কাজ করা লিনাস পলিং এর বল স্টিক মডেল এপ্রোচের অণুকরণে বিভিন্ন মডেল নিয়ে কাজ শুরু করলেন এই দুই গবেষক ।

গঠন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ওয়াটসন-ক্রিকের এরুপ ‘3D model approach’ কে গবেষণাগত সীমাবদ্ধতার ফলাফল হিসেবেও দেখেন কেউ কেউ।তাদের মতে, ওয়াটসন-ক্রিকের কাছে ক্রিস্টালোগ্রাফির জন্য উচ্চমানের ডিএনএ স্যাম্পল না থাকায় ডিএনএ র আনুমানিক (hypothetical) গঠন বর্ণনার জন্যই ভৌত মডেলের সাহায্য নেন তারা ক্রিস্টালোগ্রাফিক ডাটার অপ্রাপ্তির এই কথা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়; ডাটাগুলো নিয়ে ওয়াটসন ক্রিকের আগেই অবশ্য কাজ করেছিলেন ফ্রাংকলিন যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ডিএনএ সূত্রকে পর্যায়বৃত্তিক গ্রুপগুলার মধ্যকার দূরত্ব, মনোক্লিনিক ইউনিট সেলের মাত্রা- ডিএনএর পরিপূরক সূত্র দুইটির সহাবস্থান তথা ডাবল হেলিক্স মডেল প্রমাণ করবার জন্য যা যথেষ্ট।এই তথ্যের সত্ত্ব ফ্রাংকলিনের কাছে সংরক্ষিত থাকলেও অনেকটা তার অগোচরেই পেরুটযের মারফত ডাটার রাফ কপি পৌছে যায় ওয়াটসন ক্রিকের কাছে।

মজার ব্যাপার ছিল এই যে, এ ঘটনার আরও দু বছর আগে কিংস কলেজের এক সেমিনারের লেকচারে ফ্রাংকলিন যে ডাটা প্রদর্শন করেছিলেন সেগুলোর সাথে এই ডাটার ছিল হুবহু মিল, আর এ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন ওয়াটসনও। অর্থাৎ ওয়াটসন ক্রিকের এই রিসার্চ ফাইন্ডিংস আরো দু বছর আগে পাওয়া সম্ভব ছিল।একই সময় কাজ করছিলেন লিনাস পলিং তার ট্রিপল ডিএনএ হেলিক্স মডেল নিয়ে কিন্তু সফলতার কাছাকাছি গিয়েও শেষ পর্যন্ত ভুল প্রমাণিত হয় এই মডেলটি।প্রথমদিকে এক্স রে ডিফ্রাকশন ডাটা এবং শেষমেষ বল স্টিক মডেলের সাহায্য নেন পলিং।পলিং এর মডেলের ত্রুটি ছিল ফসফেট গ্রুপের অবস্থান নিয়ে, মডেলে দেখানো হয়েছে শ্যুগারের বেইস অংশটি বাইরের দিকে থাকায় ফসফেট গ্রুপগুলো নিজেদের মধ্যে বন্ড তৈরির মাধ্যমে হেলিক্স তৈরি করছে।কিন্তু স্বাভাবিকভাবে এটা অদ্ভুত একটা ব্যাপার কারণ ঋণাত্বক চার্জবিশিষ্ট ফসফেট গ্রুপগুলো এভাবে বন্ড করতে থাকলে নিউক্লিওটাইডগুলোর মধ্যে বিকর্ষণ বলের যে উদ্ভব ঘটবে তাতে করে হেলিক্স এর অস্তিত্বই থাকার কথা না।

ফ্রাংকলিনের ডাটা নিয়ে কাজ করবার সময় ক্রিক লক্ষ্য করলেন, তার এ যাবত করা গবেষণায় হর্স হিমোগ্লোবিনের জিনে ডিএনএ র মনোক্লিনিক ইউনিট ডাটা ফ্রাংকলিনের সাথে অনেকটাই মিলছে।ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন এর পূর্ব অভিজ্ঞতা ক্রিককে শক্তপোক্তভাবেই অনুমান করতে সহায়তা করে ডিএনএ সূত্রকের জোড়ায় জোড়ায় অবস্থানের নেপথ্যের কারণ, যা ফ্রাংকলিনের পক্ষে করা সম্ভব হয় নি।ফ্রাংকলিনের ল্যাব নোটবুক ঘেটে যতদূর অনুমান করা যায় তিনি সংগ্রহকৃত ডাটার জটিল ম্যানিপুলেশনের প্রয়োজনীয়তা সে সময় বুঝতে পারেন নি।ফ্রাংকলিনের ডাটা বিশ্লেষণের পর যথারীতি ভৌত মডেলও তৈরি হলো!ডাবল হেলিক্স মডেলের ক্যালকুলেশন ব্যতীত ডিএনএ সূত্রকের সহাবস্থান নিয়ে ফ্রাংকলিনের কিছু অনুমান হেলিক্স স্ট্রাকচারের সমর্থনে কাজে দেয়।যেমন,প্রথমত ডিএনএ সূত্রকদ্বয়ে নিউক্লিওটাইডগুলোর সজ্জাক্রম এমন যে সূত্র দুইটি একে অন্যের পরিপূরক (আধুনিক পরিভাষায় 'ডিএনএ রেপ্লিকেশন' এর পূর্বশর্ত ধরা হয় এটিকে)দ্বিতীয়ত নিউক্লিওটাইডের সজ্জাক্রমে অনির্দিষ্টতা যা প্রজাতিভেদে ডিএনএ বৈচিতর্য্তাকেই নির্দেশ করে।

তবে এ সিদ্ধান্তসমূহের কোনোটিকেই ম্যাথমেটিকাল বা কেমিক্যাল মডেলে উপস্থাপন করবার জন্য পর্যাপ্ত সময় তখন ছিল না কারণ ততোদিনে ওয়াটসন ক্রিকের ডাবল হেলিক্স মডেল পরিচিতি পেতে যাচ্ছে।ওয়াটসন ক্রিকের প্রস্তাবিত এই মডেল প্রদর্শনে ফ্রাংকলিন উইল্কিনসনকে পরে আমন্ত্রণও জানানো হয়।এর প্রতি সমর্থনও জানান ফ্রাংকলিন।তবে ফ্রাংকলিনের ডাটার উপর ভিত্তি করে ওয়াটসন ক্রিকের প্রস্তাবিত যেই মডেলের জন্য তাদের নোবেল পুরষ্কার প্রদান করা হয় , ফ্রাংকলিনের নাম তখনও থেকে যায় উপেক্ষিত।

ড্রাকুলিন

“The blood is the life”-ড্রাকুলার রক্ত হিম করা হাসি শুনেনি এমন লোক কমই পাওয়া যাবে।অবশ্য বাস্তবের কথা বলছিনা, বলছি “ড্রাকুলা” মুভির কথা।এই চরিত্র নিয়ে আছে কার্টুন-টিভিসিরিজ,ভিডিও গেইম। মজার ব্যাপার,এই চরিত্রের নামের আদলে একটি রাসায়নিক যৌগও আছে।যৌগটি হচ্ছে ‘ড্রাকুলিন’।

ড্রাকুলিন মূলত “anticoagulant” গুণসম্পন্ন একটি গ্লাইকোপ্রোটিন যা ১৯৯৮ সালে গবেষকরা ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের (Desmodus rotundus) লালাতে খুঁজে পেয়েছিলেন।যখন ঐ বাদুড় তাদের শিকারকে কামড় দেয়, তখন বাদুড়ের লালাতে থাকা একটি anticoagulant প্রোটিন শিকারের রক্তে বাহিত হয় যেটি শিকারের দেহে রক্তের তরলতা বজায় রেখে রক্তপানে সহায়তা করে।এই Anticoagulant প্রোটিনের একটি উপাদান ডেসমোটেপ্লেজ বা DSPA (DSPA:Desmodus Rotundus Salivary Plasminogen Activator) , এই উপাদানটিই ড্রাকুলিন নামে পরিচিত।

বিখ্যাত উপন্যাস “ড্রাকুলা” এর ভ্যাম্পায়ার এবং ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের মধ্যে রক্ত চোষার মিল থাকায় লালাতে থাকা এই গ্লাইকোপ্রোটিনটিকে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র “কাউন্ট ড্রাকুলা”র নামে “ড্রাকুলিন” নামকরণ করা হয়।

৪১১ টি এমিনো এসিড নিয়ে গঠিত গ্লাইকোপ্রোটিনটি মূলত একটি সিংগেল চেইন পলিপেপটাইড,যার ওজন ৮৮.৫ কিলোডাল্টন।

ড্রাকুলিন রক্ত তঞ্চনে সহায়তাকারী ফ্যাক্টর “IX”এবং “X” কে বাধা প্রদান করে কিন্তু অন্যান্য ফ্যাক্টর যেমনঃ থ্রোম্বিন, ট্রাইপসিন বা কাইমোট্রিপসিনের উপর এর কোনো প্রভাব নেই তথা ফাইব্রিনোলিটিক ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ করে না।ক্ষেত্রবিশেষে ড্রাকুলিনের এই বাধাদানকারী প্রক্রিয়া খুব দ্রুত হয় ।বিস্ময়কর তথ্য হচ্ছে, যেকোন ফ্যাক্টরের উপর ড্রাকুলিনের বাধাদানকারী কার্যকলাপ (যেমনঃ ফ্যাক্টর IX এবং X কে বাধা দেয়) অন্য ফ্যাক্টরের উপস্থিতি (যেমনঃ ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন ইত্যাদি) দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

প্রাথমিকভাবে গবেষণায় ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের লালায় দুই ধরনের ড্রাকুলিন এর উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে যাদের গঠনে এতটাই মিল যে তাদের পৃথক করা দুস্কর।এর মধ্যে একটি IX ফ্যাক্টরকে এবং অন্যটি X ফ্যাক্টরকে বাঁধা দেয়।ড্রাকুলিন প্লাজমাতে গিয়ে থ্রমবিন উৎপাদনের ল্যাগ ফেইসের স্থিতিকালকে বাড়িয়ে দেয়। পর্যাপ্ত থ্রম্বিনের অনুপস্থিতি রক্ত জমাতে তো পারেই না, বরং রক্তের অবিরাম প্রবাহমানতা বজায় রাখে।

গবেষকরা ড্রাকুলিনকে বর্তমানে ওষুধে ব্যবহার করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।এর “Anticoagulant” ধর্মের জন্য স্ট্রোক এবং হার্ট অ্যাটাকের চিকিৎসায় এর কার্যকারিতা থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধে “blood thinner” হিসাবেও এটি ব্যবহার হতে পারে।“Ischemic stroke” বা মস্তিস্কে রক্তজমাট প্রতিরোধে ড্রাকুলিনের দীর্ঘকালীন কার্যকারিতা ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে।

ফুলের কেন এত রং

"হোক কলরব ফুলগুলো সব
লাল না হয়ে নীল হলো ক্যান?" -

সংগীতশিল্পী অর্ণবের গানের এই লাইনটির মতো আমাদের অনেকের মনেই হয়তো প্রশ্ন জাগে ফুলের বিভিন্ন রং আর প্রজাতিভেদে সেইসব রংয়ের মধ্যে এমন ভিন্নতা হয় কিভাবে? প্রশ্নের সহজ উত্তর- উদ্ভিদকোষে উপস্থিত কিছু রাসায়নিক যৌগই ফুলের এত আকর্ষণীয় রংয়ের মূল কারণ। এই যৌগগুলোর বিশেষ একটি নামও আছে। এগুলোকে বলা হয় পিগমেন্ট বা রঞ্জক পদার্থ।

কোনো বস্তুতে যখন সূর্যের আলো এসে পড়ে, বস্তুটি আলোর সাতটি রঙের মধ্যে এক বা একাধিক রং শোষণ করে; বাকিগুলোর প্রতিফলন হয়। আমাদের চোখ এই প্রতিফলিত রশ্মির রংই দেখতে পায় আর বস্তুটিকে তখন সেই রংয়ের মনে হয়। কোনো বস্তু কোন রংয়ের আলো শোষণ করবে তা নির্ভর করে বস্তুর বিশেষ কিছু গঠন কাঠামো অথবা বস্তুতে উপস্থিত কিছু রাসায়নিকের গঠনের উপর। কিছু যৌগে এমন কতোগুলো কার্যকরী মূলক (Chromophore) থাকে, যেগুলো সূর্যের আলো থেকে নির্দিষ্ট কিছু রং এর আলোকরশ্মি শোষণ করতে পারে। এই যৌগগুলোকেই পিগমেন্ট বলে।

উদ্ভিদদেহে উপস্থিত পিগমেন্টগুলো মূলত তিনটি গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত: পরফাইরিন, ফ্ল্যাভোনয়েড ও ক্যারোটিনয়েড। পরফাইরিন গ্রুপের ক্লোরোফিল নামক যৌগের কারণেই কিন্তু গাছের পাতার রং সবুজ হয়। আর ফ্ল্যাভোনয়েড আর ক্যারোটিনয়েড গ্রুপের যৌগ ফুলের বাহারী রং প্রদান করে।

ফ্ল্যাভোনয়েড গ্রুপের অন্যতম প্রধান যৌগ হলো অ্যান্থোসায়ানিডিন। এটি অ্যান্থোসায়ানিন নামক গ্লাইকোসাইড যৌগ হিসেবে উদ্ভিদকোষের ক্ষুদ্র ভ্যাকিউলে উপস্থিত থাকে। এটি মূলত একটি পলিফেনল জাতীয় যৌগ যা দুইটি ফিনাইল রিং, একটি হেটেরোসাইক্লিক রিং এবং ফিনাইল রিংগুলোতে এক বা একাধিক হাইড্রোক্সিল গ্রুপ নিয়ে গঠিত। অ্যান্থোসায়ানিডিন যৌগই অধিকাংশ ফুলের রংয়ের জন্য দায়ী। এটির উপস্থিতি ফুলে কমলা, লাল থেকে শুরু করে বেগুনি ও নীল পর্যন্ত যেকোনো রং দিতে পারে। যৌগটির B-ring এ হাইড্রোক্সিল গ্রপের সংখ্যার ভিন্নতার উপর নির্ভর করে এটি আবার তিন ধরনের হতে পারে।

- পেলারগনিডিন (Pelargonidin): এটির উপস্থিতি ফুলকে কমলা রং প্রদান করে।
- সায়ানিডিন (Cyanidin): ফুলের লাল রংয়ের জন্য প্রয়োজন এই যৌগের।
- ডেলফিনিডিন (Delphinidin): এটি ফুলকে বেগুনি ও নীল জাতীয় রং প্রদান করে।

ফুলের রং এর জন্য প্রয়োজনীয় আরেক শ্রেণির পিগমেন্ট হলো ক্যারোটিনয়েড। এই ধরনের যৌগ ফুলে প্রধানত হলুদ এবং কিছু ক্ষেত্রে হালকা কমলা ও লাল রং তৈরি করে।এই শ্রেণির প্রধান যৌগ হলো ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিল।

তবে শুধুমাত্র এই যৌগগুলোর উপস্থিতি ফুলের রং প্রদানে যথেষ্ট নয়। রঙের প্রকৃতি পরিবর্তন ও অন্যান্য মিশ্র রং এর জন্য আরো কয়েকটি বিষয় জরুরী। সাধারণত ফুলের কোষে উপাদানসমূহের ঘনমাত্রা, কোষের pH এবং তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করে রংগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।এছাড়া বিভিন্ন কো-পিগমেন্টের উপস্থিতি প্রধান পিগমেন্টের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করতে পারে।

আবার কিছু রং তৈরিতে প্রধান পিগমেন্ট যৌগের গঠনগত পরিবর্তন প্রয়োজন। যেমনঃ অ্যান্থোসায়ানিডিনে এক বা একাধিক হাইড্রোক্সিল গ্রুপের পরিবর্তে মিথাইল (-CH3) অথবা কোনো সুগার গ্রুপের উপস্থিতির কারনে রং হয় গাঢ় লাল। অপরদিকে, ফ্ল্যাভোন ও বিভিন্ন ধাতব আয়নের উপস্থিতিতে ফুল হয় উজ্জ্বল নীল।

কোনো একটি ফুলে কোন ধরনের পিগমেন্ট থাকবে সেটি নির্ধারণ করে কয়েকটি নির্দিষ্ট জিন। এই জিনগুলোর বৈশিষ্ট্য প্রজাতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে এবং সেই কারণেই একই ফুলের বিভিন্ন রং এর প্রজাতিও পাওয়া যায়।

ফুলের বিচিত্র রংয়ে মুগ্ধ হই আমরা প্রতিনিয়তই। তবে রঙিন ফুলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উজ্জ্বল রংয়ের মাধ্যমে ফুলগুলো কীটপতঙ্গ, মৌমাছি ও পাখিদের আকৃষ্ট করে। এরা এক ফুল থেকে অন্য ফুলে গমনকালে ফুলের রেণু স্থানান্তর করে।এই পদ্ধতিতে ফুলে পরোক্ষ পরাগায়ন ঘটে।

রঙিন ফুলের রসায়ন নিয়ে তো কিছুটা জানা গেল।এখন তাহলে অর্ণবের প্রশ্নের রাসায়নিক উত্তর ভাবা যাক!!
অ্যান্থোসায়ানিন নামক রঞ্জকের ভিন্নতার কারনেই সব ফুল লাল না হয়ে নীলও হয়!

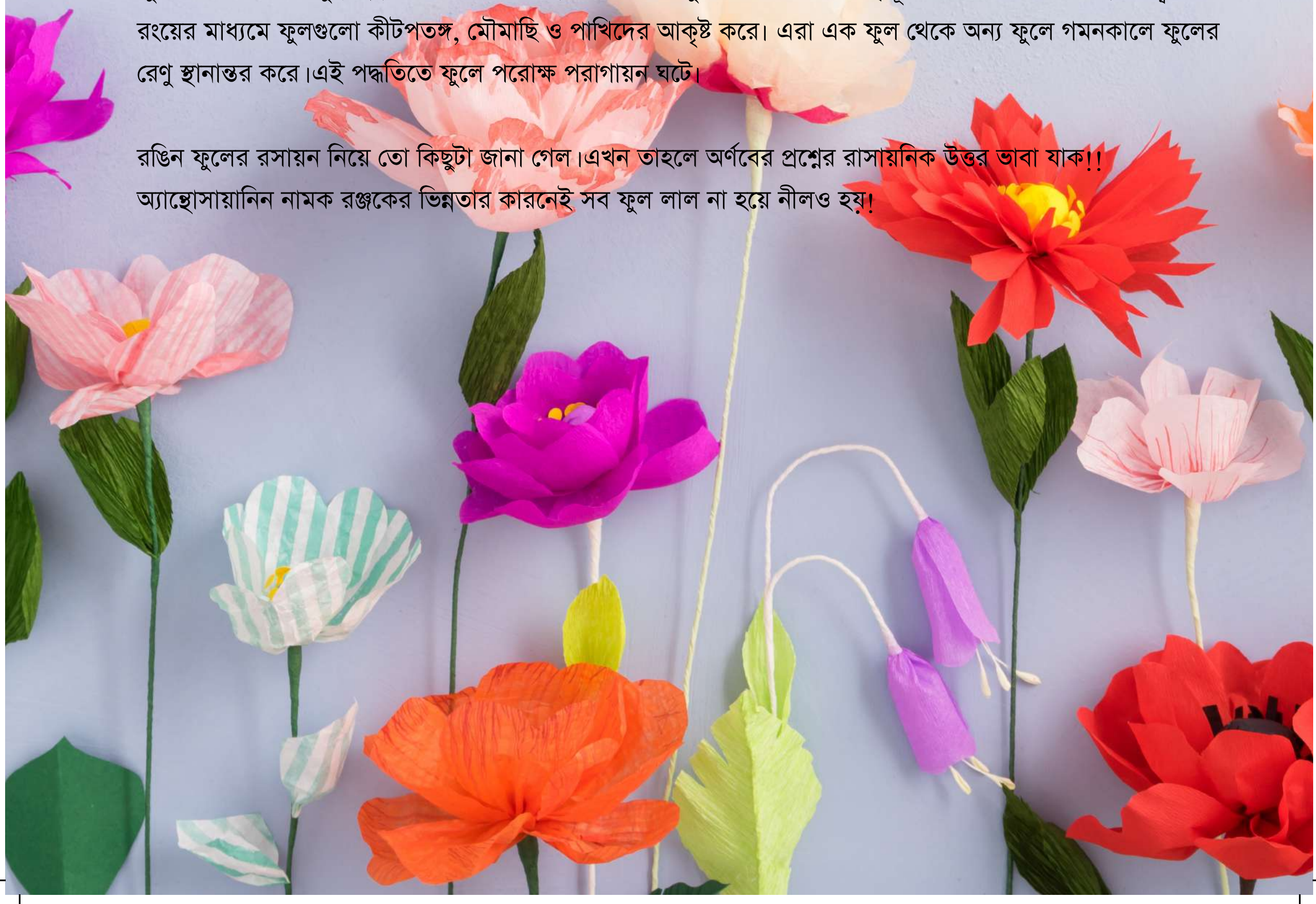

ছিলিয়াম
জ্যোতিরসায়ন

ChemFusion
www.chemfusion.net

ফ্লুইড মেকানিকস মিস্ট্রি সলভড

ব্রায়ান ডি. উডের সাম্প্রতিক গবেষণা ফ্লুইড মেকানিক্স এর এমন একটি রহস্য সমাধান করেছে যা প্রায় ৭০ বছর ধরে বিজ্ঞানীদের কাছে একটি বিস্ময়কর ব্যাপার ছিলো।

দূষিত পদার্থ কিভাবে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে কিংবা ড্রাগ কিভাবে মানব শরীরের টিস্যুতে ব্যাপিত হয় এ সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা পেতে হলে, রাসায়নিক দ্রব্যের তরলে মিশ্রিত হওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে হবে।এক্ষেত্রে ব্রিটিশ ফিজিসিস্ট এবং ম্যাথমেটিশিয়ান জি. আই. টেইলর এর ডিসপারশন থিওরি কার্যকরী প্রমাণিত হয়েছিলো কিন্তু এর সীমাবদ্ধতাও ছিলো।

টেইলর এর ডিসপারশন থিওরি অনুযায়ী, তরলের বেগের তারতম্যই রাসায়নিক দ্রব্যকে তরলে ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে।ম্যাক্রোস্কোপিক ডিসপারশন ইকুয়েশন ব্যবহার করে এই থিওরিই সর্বপ্রথম বিজ্ঞানীদের বিচ্ছুরণের স্থিতাবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করতে সাহায্য করে।ইকুয়েশনটি তরলে একটি রাসায়নিক দ্রব্যের সামগ্রিক চলাচল বর্ণনা করার পাশাপাশি, রাসায়নিক দ্রব্যটি তরলে প্রবেশ করতে যতটুকু সময় নেয় সে সম্পর্কেও ধারণা দিতে পারে।

থিওরিটি সফল প্রমাণিত হলেও, টেইলরের ধারণাকৃত অধিকতর স্থিতিশীল অবস্থায় পৌছানোর জন্য তরলের প্রাথমিক গতিশীল অবস্থা হতে কিভাবে বিচ্ছুরণ ছড়িয়ে পড়ে তা ব্যাখ্যা করতে পারে নি এই থিওরি।বিজ্ঞানীরা তাই ইকুয়েশনটিতে সময়-নির্ভর ডিসপারশন কোইফিশিয়েন্ট যোগ করেন।ফলে কিছুটা সফলতা দেখা গেলেও, কোইফিশিয়েন্টটি নিজেই নতুন সমস্যার সৃষ্টি করতো।

পরবর্তী বহু বছর ধরে টেইলরের ডিসপারশন থিওরির সীমাবদ্ধতার সমাধান করা সম্ভব হয় নি।সম্প্রতি অরেগন ইউনিভার্সিটির এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেসর উড তাঁর দীর্ঘ গবেষণার ফলস্বরূপ ফ্লুইড মেকানিক্স এর একটি মৌলিক ভিত্তি, টেইলরের ডিসপারশন থিওরির সীমাবদ্ধতার সমাধান করতে সক্ষম হয়েছেন।

তরলে রাসায়নিক দ্রব্যের ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে উড বললেন, "বিচ্ছুরণ ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়াটি সময়ের সাথে বাড়তে থাকার প্রবণতা দেখায় যতক্ষণ না তারা একটি স্থিতাবস্থায় পৌঁছায়।আপনি এটিকে স্টার্ট আপ ইনভেস্টমেন্ট এর সাথে তুলনা করতে পারেন।যেখানে অধিকতর টেকসই বা ধ্রুবক অবস্থায় পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত রিটার্ন এর হার প্রাথমিকভাবে অনেক বেশি হতে পারে।'

উড তাঁর বক্তব্যে টেইলরের সমকালীন গবেষকরা কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর যতটা উন্নতি সাধন করেছিলেন, টেইলরের কাজকে তার সমকক্ষ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।তবে এর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বলেছেন, "রাসায়নিক দ্রব্যগুলোকে দুইটি আলাদা সময়ে তরলে মিশ্রিত করা হলে ডিসপারশন কোএফিশিয়েন্ট হিসেবে কোন সময়কে বিবেচনা করা হবে? টেইলর নিজেও বুঝেছিলেন, একটি সময়-নির্ভর কোএফিশিয়েন্ট ব্যবহার করা হলে সমসাময়িক থিওরিগুলো পদার্থবিদ্যার মৌলিক ধারণা ও কজ্যালিটির বিরোধিতা করবে।'

উড এবং তাঁর সমন্বয়করা অন্য একটি সূত্র, থিওরি অফ পারশিয়াল ডিফারেনশিয়েশাল ইকুয়েশন ব্যবহার করেন।এর মাধ্যমে তারা দেখাতে সক্ষম হন যে, সময়-নির্ভর কোএফিশিয়েন্ট ব্যবহারের সমস্যা মূলত তরল বা দ্রবণে মিশ্রিত রাসায়নিক দ্রবের প্রাথমিক অবস্থা হতে স্থিতাবস্থায় পৌছানোকে উপেক্ষা করার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে।

উড এর মতে, রাসায়নিক দ্রব যখন তরলে মেশানো হয় তখন প্রাথমিক অবস্থায় এদের আচরণ ডিসপারশন এর মতো সমীকরণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার আবশ্যকতা নেই।বরং প্রারম্ভিক অবস্থা হতে এদের স্থিতাবস্থায় পৌঁছানোই গুরুত্বপূর্ণ এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সময়কে বিবেচনা করতে একটি অতিরিক্ত টার্ম যুক্ত করা প্রয়োজন যা টেইলরের ম্যাক্রোস্কেল ডিসপারশন সমীকরণে অনুপস্থিত ছিলো।সমীকরণে টার্ম বলতে একটি সংখ্যা বা চলক কিংবা চলক ও সংখ্যার গুণফল বুঝায়।

উডের নতুন টার্মটি টেইলরের ডিসপারশন সমীকরণের সীমাবদ্ধতা দূর করে একে নতুন রূপ দান করেছে।ফলে সমীকরণটি এখন তরলের মধ্যে প্রযুক্ত রাসায়নিক দ্রব্যের প্রারম্ভিক অবস্থায় সঠিক চলমান অবস্থা বর্ণনা করতে পারবে।দুটি রাসায়নিক দ্রব আলাদা সময়ে তরলে মিশ্রিত করা হলে কোন ডিসপারশন কোএফিশিয়েন্ট ব্যবহৃত হবে তা নিয়ে আগে বিজ্ঞানীরা বিপাকে পড়ে যেতেন।উডের মতে নতুন থিওরিতে এই ঝামেলা আর পোহাতে হবে না।তিনি আরও বলেছেন, "সমীকরণে ব্যবহৃত নতুন টার্মটির উপস্থিতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে দ্রবের ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়াটিকে বিবেচনার জন্য সমন্বয় সাধন করবে।'

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, উডের এই গবেষণা শুধু যে ফ্লুইড মেকানিক্স এর মৌলিক একটি থিওরিকে সংশোধন করেছে তা নয়, বরং নতুন থিওরিটি অন্য থিওরিতে উপস্থিত সময়-নির্ভর ডিসপারশন কোএফিশিয়েন্টের প্যারাডক্স ও সমাধান করতে সক্ষম হবে।অর্থাৎ, উডের এই সাফল্য ফ্লুইড মেকানিক্সে নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করতে চলেছে।

কক্ষ তাপমাত্রায় সুপারকন্ডাক্টর : ইলেকট্রনিক্স এ নতুন সম্ভাবনা

Superconductivity বা অতিপরিবাহিতা হলো পদার্থের সেই ধর্ম যাতে একটি নির্দিষ্ট ক্রান্তীয় তাপমাত্রার (Critical temperature) নিচে কোনো পদার্থ অতিপরিবাহীতে পরিণত হয় (রোধ হয় শূন্য) এবং এর মধ্য দিয়ে চৌম্বকীয় ফ্লাক্স এর প্রবাহকে প্রতিরোধ করে। বর্তমানে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও ম্যাগনেটিক যন্ত্রসমূহে সুপারকন্ডাক্টর এর ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেশ কয়েকটি ধাতু, ধাতব alloy ক্রান্তীয় তাপমাত্রার নিচে অতিপরিবাহী হিসেবে কাজ করে।তবে অধিকাংশ সুপারকন্ডাক্টর এর ক্ষেত্রে ক্রান্তীয় তাপমাত্রার মান ১-৫০ কেলভিন এর মধ্যে।এত কম তাপমাত্রা অর্জন এবং ব্যবহার কষ্টসাধ্য হওয়ায় গবেষকরা কক্ষ তাপমাত্রায় অতিপরিবাহিতা প্রদর্শন করে এমন যৌগের সন্ধান করছিলেন।

কক্ষ তাপমাত্রায় সুপারকন্ডাক্টর তৈরিতে অবশেষে সক্ষম হয়েছেন গবেষকরা। কার্বন-হাইড্রোজেন-সালফার এর সংমিশ্রণে তৈরি এই যৌগ ২৮৭.৭ কেলভিন তাপমাত্রায় (প্রায় ১৫° সেলসিয়াস) এবং ২৬৭ গিগাপ্যাসকেল চাপে অতিপরিবাহীতে রূপান্তরিত হয়। যদিও এই অত্যধিক উচ্চ চাপ অর্জন এই প্রক্রিয়ার ব্যবহারিক প্রয়োগে একপ্রকার বাধা, তবে গবেষকরা আশা করছেন, যৌগটিতে কার্বন-সালফার-হাইড্রোজেন এর পরিমাণগত অনুপাতে তারতম্যের মাধ্যমে আরো কম চাপেই ভবিষ্যতে এই যৌগের অতিপরিবাহী বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে।

চলুন এবার তাহলে এই গবেষণার কিছুটা বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া যাক।

প্রথমত, কক্ষ তাপমাত্রায় সুপারকন্ডাক্টর তৈরিতে কার্বন-সালফার-হাইড্রোজেন যৌগ ব্যবহারের কারণ ছিলো :

■ হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) কিছু অসামঞ্জস্য বিক্রিয়া (Disproportionation reaction) এর মাধ্যমে H_3S এ পরিণত হতে পারে যা প্রায় ২০৩ কেলভিন তাপমাত্রায় (আবিষ্কৃত সব যৌগের মধ্যে সর্বোচ্চ) বিশেষ শর্তে অতিপরিবাহিতা প্রদর্শন করে।

■ কোনো যৌগে হাইড্রোজেনের আনুপাতিক পরিমাণ যত বৃদ্ধি পায়, সেটির অতিপরিবাহিতা প্রদর্শনের প্রবণতা তত বাড়ে।

■ CH_4 এবং H_2S উভয় যৌগই হাইড্রোজেনের সঙ্গে host-guest relationship এর মাধ্যমে অন্তর্ভূক্তি যৌগ (inclusion complex) তৈরি করতে পারে যাতে হাইড্রোজেন এর পরিমাণে ভিন্নতা আনা সম্ভব।

কিভাবে যৌগটি তৈরি হলো?

কাঙ্খিত যৌগটি তৈরির জন্য প্রথমে কার্বন ও সালফারের ১:১ অনুপাতের মিশ্রণ তৈরি করা হয় এবং মিশ্রণটিকে অতিক্ষুদ্র কণায় (৫ মাইক্রন) পরিণত করা হয়।

এইবার স্যাম্পলটিতে একটি ডায়মন্ড এলভিন সেলের (Diamond Alvin Cell) মাধ্যমে উচ্চচাপ (গিগাপ্যাসকেল লেভেলের) প্রদান করা হয়।

(ডায়মন্ড এলভিন সেল এ সাধারণত দুইটি মুখোমুখি অবস্থিত ডায়মন্ড ক্রিস্টালে বল প্রয়োগের মাধ্যমে এদের মাঝে রাখা স্যাম্পলে প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করা সম্ভব।)

এরপর স্যাম্পলে হাইড্রোজেন গ্যাস চালনা করা হয় যা একাধারে বিক্রিয়ক এবং চাপ পরিবহনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

ডায়মন্ড সেলের মাধ্যমে স্যাম্পলে প্রায় ৪ গিগাপ্যাসকেল চাপ প্রয়োগ হয় এবং এই অবস্থায় স্যাম্পলটিতে লেজার রশ্মির (৫৩২ ন্যানোমিটার) প্রয়োগের ফলে সালফার মৌলে অবস্থিত সালফার-সালফার বন্ধন ভেঙ্গে সালফার ফ্রি র‍্যাডিকেল তৈরি হয় যা পরবর্তীতে হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয়ে সালফার হাইড্রাইড গঠন করে।

যৌগটির অতিপরিবাহিতা ধর্ম প্রমাণিত হয় নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ের মাধ্যমে :

যৌগটির অতিপরিবাহীতে রূপান্তর প্রমাণিত হয় এর রোধের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে। ২৮৭ কেলভিন তাপমাত্রার কাছাকাছি যেতেই যৌগটির রোধ তাৎক্ষণিক শূন্যে নেমে আসে যা অতিপরিবাহীর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

সুপারকন্ডাক্টরের আরেকটি বিশেষ ধর্ম হলো, এর চৌম্বকীয় সংবেদনশীলতায় (Magnetic susceptibility) পরিবর্তন। অতিপরিবাহী যৌগগুলো সাধারণত বিশেষ ডায়াম্যাগনেটিক বৈশিষ্ট্য (মেইস্নার ইফেক্ট) প্রদর্শন করে। প্রস্তুতকৃত কার্বন-সালফার-হাইড্রোজেন যৌগটি প্রায় ১৯০ গিগাপ্যাসকেল চাপ পর্যন্ত এই বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনে সক্ষম হয়।

এছাড়াও বাহ্যিক চৌম্বকক্ষেত্রের প্রভাবে যৌগটির অতিপরিবাহীতে পরিবর্তনে এর ক্রান্তীয় তাপমাত্রা হ্রাস পায় এবং চৌম্বকক্ষেত্রের একটি নির্দিষ্ট ক্রান্তীয় মান পর্যন্ত এটি অতিপরিবাহী বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারে।

Raman Spectroscopy এর মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত যৌগের গঠন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

Chemistry Article Writing Contest
Season-1

1ST

Can Geoengineering Be A Probable Solution To Global Warming?

Nymun Muntaha Aranna
Department of Chemistry
University of Dhaka

Can Geoengineering Be A Probable Solution To Global Warming?

The eruption of Mount Pinatubo was the second largest volcanic eruption of the 20th century, which launched millions of tons of aerosols in the stratosphere, decreasing the global average temperature by 0.5 °C lasting for about three years. Now the question is: Can we control the temperature recreating the situations of the Mount Pinatubo event in this era of global warming?

Defined by The Royal Society geoengineering is ".....the deliberate large scale intervention in the Earth's climate system, in order to moderate global warming." In broader terms, geoengineering is any technological idea that can slow, stop or eventually reverse the process of global warming and climate change.

Geoengineering is divided into two subcategories :

- Solar Radiation Management (SRM)
- Carbon Dioxide Removal (CDR)

Solar radiation management refers to offsetting the warming effect of greenhouse gases by reflecting more solar radiation back into space. About 29% of the solar radiation hitting the Earth is reflected back to space by bright surfaces like ice, deserts, snow or clouds. The Earth will trap less radiation if more of it can be reflected back to space.

This can be done by increasing the planetary albedo by marine cloud brightening, creating reflective aerosols, such as stratospheric sulfate aerosols, by protecting natural heat reflectors including sea ice, snow, and glaciers, and ocean sulphur cycle enhancement.

Volcanic eruptions like the Mount Pinatubo incident eject millions of tons of particles and gas high in the atmosphere. One of these gases is sulphur dioxide, a nasty smelling, invisible gas combining with water molecules as sulphuric acid creates an acid/water veil up in the atmosphere. These veils reduce the sunlight reaching the Earth's surface, preventing global warming to some extent.

Carbon dioxide removal refers to removing CO2 from the atmosphere and sequestering it for a long period of time. CDR directly addresses the root cause of climate change- the accumulation of CO2 in the atmosphere. There are many proposed methods of CDR. The direct methods are employed in removing the gas from the atmosphere through huge vents and the indirect ones include afforestation, reforestation, forest restoration to absorb CO2. The 'Carbon capture and storage' process includes techniques like creating bio-char for mixing it into soil to create terapreta, bioenergy with carbon capture and storage to sequester carbon and simultaneously provide energy, carbon air capture to remove carbon dioxide from ambient air, and ocean afforestation and ocean fertilization (includes iron fertilization of the oceans).

But the sad truth is that, we are opting to run a geoengineering experiment to change the face of the Earth at a time when we are producing 40 billion tons of CO2 a year. How far this geoengineering can go in reducing global warming is a million dollar question.

Geoengineering can not stop climate change, nor is it a solution of any kind. But it can buy us some precious time until we find a renewable energy source which will help us cope with the changing climate, along with pulling some CO2 out of the atmosphere.

ছিলিয়াম
জ্যোতিরসায়ন

ChemFusion
www.chemfusion.net

2ND

বিবলিকোর - পুরোনো বইয়ের ঘ্রাণ

আলিফা আরা হিয়া,
রসায়ন বিভাগ,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

গন্ধ জিনিসটা খুব অদ্ভুত।কখনো এমন হয়েছে কি কোনো সাবানের ঘ্রাণ শুঁকে ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেছে? আবার আমাদের অনেকের কত রকম গন্ধই না প্রিয়! কারো ভালো লাগে পেট্রোলের গন্ধ, আবার কারও ভালো লাগে রৌদ্রজ্জ্বল দিনে এক পশলা বৃষ্টির পর ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ, আবার কারও পছন্দ পুরনো বইয়ের গন্ধ! এই যে এসব ঘ্রাণ এদের পিছনে কিন্তু দায়ী কিছু উদ্বায়ী জৈব যৌগ যাদেরকে রসায়নের ভাষায় বলে Volatile Organic Compounds (VOCs).

বেশ কিছুদিন আগের কথা।একটা অনেক পুরনো হলদে হয়ে যাওয়া বই হাতে পেয়ে পড়ছিলাম।কিন্তু পড়ব কি, এত মিষ্টি একটা ঘ্রাণ আসছিল বইটার পাতা থেকে, বারবার শুঁকেও যেন মন ভরে না।একটা অদ্ভুত ফুলের আর ভ্যানিলা আইসক্রিমের মত ক্রিমি ফ্লেভারের ঘ্রাণ ছিল সেই পাতার।মনে পড়ল আরও কিছু পুরনো বই থেকে ঠিক এ ঘ্রাণটা পেতাম।ব্যাপারটা কি? আগে কি মানুষ বই প্রস্তুতের সময় আতর বা সুগন্ধি মিশিয়ে দিত? না না, আসলে কোনো মিস্ট্রি নেই ব্যাপারটাতে।তাহলে এখানে যে কি কেমিস্ট্রি চলুন দেখে আসি একটু।

পুরনো বই থেকে আসা মিষ্টি গন্ধটার জন্য দায়ী মূলত লিগনিন যা কাঠ থেকে প্রস্তুত প্রায় সব কাগজেই কমবেশি থাকে। ১৮৫০ সালের আগে বেশিরভাগ বইই তৈরি হত সুতা অথবা লিনেন থেকে।কাঠ তুলনামূলক সস্তা হওয়ায় এরপর থেকে কাগজ তৈরিতে শুরু হয় কাঠের ব্যবহার।কাঠভিত্তিক হওয়ার কারণে বেশিরভাগ আধুনিক কাগজই মূলত সেলুলোজ (কাঠের প্রধান উপাদান) ও লিগনিন অণু নিয়ে গঠিত।লিগনিন অণু হলো পৃথিবীতে পাওয়া সবচেয়ে বেশি জৈব পলিমারগুলোর মধ্যে অন্যতম।এটি গাছের সেলুলোজ অণুগুলিকে একসাথে বেঁধে রেখে গাছকে মজবুত হতে সাহায্য করে।বছরের পর বছর পার হওয়ার সাথে সাথে বেশকিছু নিয়ামক যেমন সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি, আর্দ্রতা ও কাগজে থাকা এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লিগনিন অণু ক্রমাগত ক্ষয় (degrade) হতে থাকে।অর্থাৎ লিগনিনে উপস্থিত রাসায়নিক বন্ধনগুলো ভেঙ্গে যায় এবং ছোট ছোট গ্যাসীয় ও উদ্বায়ী যৌগ তৈরি হয়।আর এটাই মূলত পুরনো বই থেকে আসা মিষ্টি ঘ্রাণের মূল কারণ।

লিগনিনের গঠনটা খেয়াল করলে দেখা যায় এর সাথে ভ্যানিলিনের (ভ্যানিলার নির্যাসে পাওয়া প্রাথমিক উপাদান) অনেক মিল রয়েছে।লিগনিন অণু বিশ্লিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে ভ্যানিলিন অণুও মুক্ত করে, যার ফলাফল পুরনো বইয়ের সেই মিষ্টি ভ্যানিলার ঘ্রাণ।

লিগনিন ছাড়াও কাগজে থাকা অন্যান্য আরও কিছু যৌগ সময়ের সাথে সাথে ভেঙ্গে যায় এবং প্রায় একশোর মত উদ্বায়ী অণু মুক্ত করে, যার প্রত্যেকটি পুরনো বইগুলোকে এক বৈশিষ্ট্যমূলক ঘ্রাণ এনে দেয়।যেমন বেনজালডিহাইড দেয় কাজুবাদামের ঘ্রাণ, ইথাইল বেনজিন আর টলুইন তাদের নিজস্ব মিষ্টি ঘ্রাণ যোগ করে, আর ২- ইথাইল হেক্সানল এক চমৎকার ফুলের সৌরভ মিশিয়ে দেয়।

এখানে আরেকটা মজার ব্যাপার বলে রাখি।প্রাকৃতিক ভ্যানিলার অর্কিড থেকে ভ্যানিলার নির্যাস পাওয়াটা অনেক ব্যয়সাপেক্ষ বলে তখনকার দিনে কাগজের কারখানাগুলো থেকেই বেশিরভাগ কৃত্রিম ভ্যানিলা তৈরি হত।১৯৮১ সালে একটি কানাডিয়ান পেপার কোম্পানি পুরো ভ্যানিলা বাজারের ৬০% দখল করে রেখেছিল।মানুষের তৈরি করা কৃত্রিম ভ্যানিলার তুলনায় আসল ভ্যানিলার দাম ছিল ২০০ গুণ বেশি! বিপুল চাহিদার কারণে মানুষ অনেক আগে থেকেই কম খরচে ভ্যানিলা তৈরির উপায় খুঁজে আসছে। যদিও প্রতি বছর প্রায় ১২০০০ টন ভ্যানিলা তৈরি করা হয়, এর ১% ও সত্যিকার ভ্যানিলার নির্যাস না।বর্তমানে যে কৃত্রিম ভ্যানিলা পাওয়া যায় তা মূলত পেট্রোলিয়াম থেকে পাওয়া guaiacol থেকে প্রস্তুত করা হয়।এখন এই নকল ভ্যানিলা থেকে আসল ভ্যানিলাকে কিভাবে আলাদা করে চেনা যায় তা নিয়ে চলছে বিজ্ঞানী আর প্রস্তুতকারকদের মধ্যে ইঁদুর-বিড়াল খেলা। বর্তমানে এই পার্থক্য বুঝতে ব্যবহৃত হচ্ছে রেডিওএক্টিভ কার্বন-১৪ আইসোটোপ।তবে সে গল্প না হয় আরেকদিন হবে?

ছিলিয়াম
জ্যোতিরসায়ন

ChemFusion
www.chemfusion.net

Triclosan (TCS) in toothpaste, a silent killer!

In Pepsodent Bangladesh, there is a line on toothpaste advertisements like ‘’every smile is inestimable’’! (Pepsodent, one of the leading toothpaste brands in Bangladesh, comes with a line in its advertisement…”

Indeed, it is most probably correct which was also realized by William Nebergall , first inventor of toothpaste & cavity protection. From then till now, every person is not only just familiar with toothpaste, but also toothpowder, mouthwash etc. dental cares. For this, many industries named Colgate Palmolive, Pepsodent Bangladesh, Dabur India Limited etc. are producing different types of dental products for people. And if we consider toothpaste, then the ingredients are about the same. For example, fluoride, calcium carbonate, sodium hydroxide, glycerol, water, sorbitol, sodium laureth sulfate (SLES), sodium lauryl sulfate (SLS), Zinc Gluconate, flavor etc. are used for various purposes in favor of oral care. But recently, Colgate Total toothpaste has “gained attention because here” triclosan is also being used as one of the main constituents "for providing antibacterial, antifungal properties.

Excessive amounts of all those components in toothpaste can be injurious to human health. Like, sodium lauryl sulfate may cause mouth ulcers, stomach difficulties, even cancer although it acts as surfactant for providing foaming. Besides, fluoride is also responsible for producing some troubles like enamel discoloration in teeth, vomiting, muscle spasms bone & neurological problems when it is swallowed a large amount. Then, constipation, dry mouth or even a high level of urine may be causing by having overmuch calcium carbonate.

But triclosan is the most harmful among all toothpaste elements for the human body. Many health practitioners, dentists are strongly delivering speeches against Colgate Palmolive since it is still continuing to use triclosan in the preparation of toothpaste. Even those people from different health sectors are staying inopposition to the U.S. Food and Drug Administration (FDA) decision in the favor of Colgate Total toothpaste.

ChemFusion
www.chemfusion.net

Triclosan, an organic compound, is a combined form of two functional groups, ethers and phenols. Here, phenol has antibacterial characteristics. So, the bacteria are gradually declared as dead when triclosan starts to hinder the lipid synthesis in those bacteria cells.

There are various reasons for avoiding the use of triclosan in health goods. For instance, some reports of that triclosan may alter the hormonal function(s) called endocrine disruption in humans. Besides, triclosan has contribution in growing breast cancer cells. Apart from this, few negative signs of triclosan may be appeared in fertility development. Even asthma, allergies may be seen among early age children due to triclosan exposure.

So, to skip the dangerous touch of triclosan, everyone should immediately avoid all health products containing triclosan, and obviously ‘’anti- microbial’’ toothpastes. Then, our smile would be really priceless!

Kanika Sorker
Department of Pharmacy
East West University

Mystery of Chocolate: Inner Chemistry

Chocolate! Just think about the word and what will come to your mind? Yummy, delicious, mouth-watering chocolate bars and candies? Some are so chocoholic that they cannot resist a piece of chocolate . Have you ever thought about why we love chocolate so much? What makes it so addictive? Let's explore the incredible "('chemical science')" behind this delicious wander.

Chemistry behind chocolate-

Chocolate basics

Main components of chocolate are like cocoa butter, milk powder, sugar "etc. among" which cocoa butter is the main ingredient. There are more than 300-500 known chemicals in chocolate. Chocolate includes chemicals like anandamin, serotonin, phenylethylamine (PEA), theobromine, caffeine, histamine, phenolics etc. All chemicals present in chocolate have effects on the human brain and also have physiological effects on the human body.

Why chocolate makes one happy?

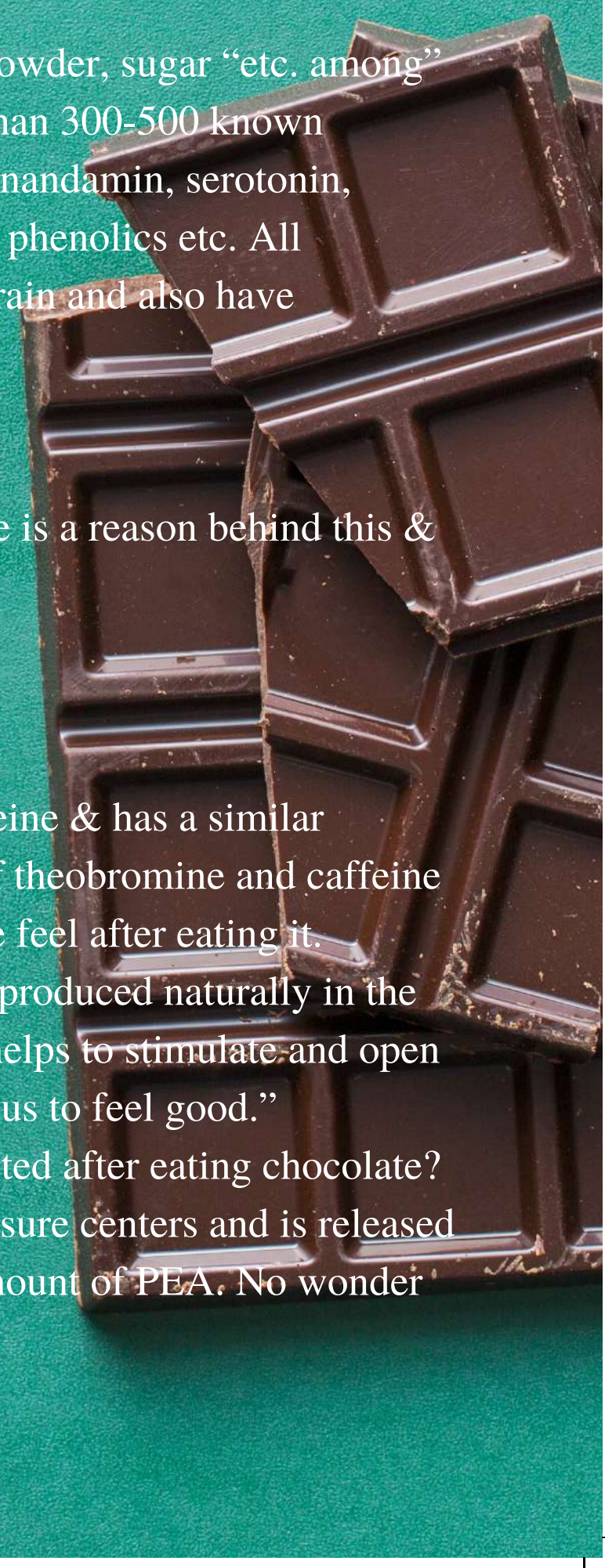

Chocolate is called the 'love drug' or 'happiness drug'. There is a reason behind this & it's due to the chemicals present in chocolate.

Let's take a look at some of them-

- Theobromine: Theobromine chemically resembles caffeine & has a similar stimulating effect on human brains. The combination of theobromine and caffeine found in chocolate is believed to create the small lift we feel after eating it.
- Anandamide: It's an endogenous cannabinoid which is produced naturally in the brain but small quantities are found in chocolate. This helps to stimulate and open synapses in the brain which . "transmit waves allowing us to feel good."
- Phenylethylamine (PEA): Ever felt lovey-dovey or excited after eating chocolate? That's the effect of PEA that stimulates the brain's pleasure centers and is released when we fall in love. Chocolate contains the highest amount of PEA. No wonder it's so popular on Valentine's day

What makes chocolate addictive?

In every square chocolate there are hundreds of compounds. Those compounds are responsible for the addictiveness of chocolate. One of those is tryptophan which is an essential amino acid found in foods & is the key ingredient in producing serotonin. Serotonin is a neurotransmitter that helps to regulate our mood. May be that's why we want to eat chocolate more and more. Theobromine and caffeine are two other substances which are responsible for many chocolate's addictiveness. Like serotonin these two can act as central nervous system depressant. Theobromine not only blocks those receptors but also couples with enhancing the good stuffs.

Is chocolate healthy?

There are is mixed research results about whether chocolate is healthy or not. Some research says that chocolate lowers the risk of certain cancers and helps to prevent heart disease while others show no benefits. Some showed evidence that eating chocolate may help preventing heart disease due to flavanol which is a bioactive compound that naturally occurs in cocoa beans. So white chocolate contains no flavanol and antioxidants as there is no cocoa bean.

Thanks to chemistry!

In the long journey to make a chocolate bar from cocoa pods chemistry plays a large role. It influences the color, texture, taste and the aroma of chocolate. So thanks to chemistry for this creation.

Fauzia Halim
Department of Chemistry
University Of Barisal

রসায়ন কিভাবে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে পরিবর্তন এনেছিল?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কথা আমরা সবাই জানি।এই যুদ্ধে রসায়নের ভূমিকা ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।এছাড়াও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যে মরণঘাতী রোগ ক্যান্সারের চিকিৎসার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলো, আমরা কয়জনই বা তা জানি?

হ্যাঁ! প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়েই মরণঘাতী রোগ ক্যান্সারের চিকিৎসার পথ উন্মোচিত হয়।

মাস্টার্ড গ্যাস কি মানুষের প্রাণ বাঁচাতে পারে?
প্রশ্নটি হয়তো শুনতে অদ্ভুত,তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মাস্টার্ড গ্যাস-জনিত বিষক্রিয়ায় মৃতদের ময়নাতদন্তে শ্বেত রক্তকণিকার পরিমাণ কম পাওয়া গিয়েছিল।গবেষকরা তখন ভেবেছিলেন, মাস্টার্ড গ্যাস যদি শ্বেত রক্তকণিকা মেরে ফেলে তবে তা দিয়ে কি চিকিৎসা করা যেতে পারে?
আমরা জানি যে ক্যান্সার প্রতিরোধক কোষগুলোকে প্রভাবিত করে ।বিজ্ঞানীগণ পরীক্ষাস্বরূপ কোষীয় স্তরে মাস্টার্ড গ্যাস এবং নাইট্রোজেন মাস্টার্ড একত্রে নিয়ে একটি মধ্যস্থতা তৈরি করে যা ডিএনএ এর দুটি হেলিকেল স্ট্যান্ড এর সাথে আবদ্ধ হয় এবং পরবর্তীতে তাদের একসাথে লক করে রাখা হয়।কারণ কোষ বিভাজনের সময় যাতে স্টর্যান্ডগুলো আলাদা হয়ে না যায় অন্যথায় কোষগুলো মারা যায়।যুদ্ধের পর গবেষকরা নাইট্রোজেনের বিকাশ করেছিলেন।মাস্টার্ড গ্যাস-জনিত প্রথম ক্যান্সার কেমোথেরাপির ওষুধগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি নাম 'মাসটিন'।যদিও যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে এর চেয়ে আরো উন্নত ড্রাগ এসেছে।তবে মাসটিন রাসায়নিক বা ক্যান্সার কেমোথেরাপির চিকিৎসার পথ প্রশস্ত করে।

বুলেট দ্বারা মৃত্যু (রোগ নয়)

তখন সৈন্যরা বেঁচে থাকতো অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, ময়লায় পরিপূর্ণ গর্তে- যেখানে সহজেই যেকোনো রোগে সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মৃত্যুর ঘটনা ঘটতো অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতিতে বাস করার কারণে।তখন বিভিন্ন রোগের চেয়ে গুলি বা স্প্লিন্টার কারণে বেশিরভাগ প্রাণহানির ঘটনা ঘটতো।চিকিৎসকরা পানি জীবাণুমুক্ত এবং নির্বীজন করতে চুনের ক্লোরাইড ব্যবহার করতেন।আয়োডিনের টিংকচার, কার্বলিক অ্যাসিড এবং ডাকিনের দ্রবণ (সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট এবং বোরিক অ্যাসিড) ক্ষত পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত হতো।

শেল-শকড

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মূলত টিএনটির মতো বিস্ফোরক ভরা আর্টিলারি শেল ব্যবহার করে লড়াই করা হয়েছিল যুদ্ধে প্রতি মিনিটে মোটামুটি ১০০টি শেল ছোঁড়া হতো, এইভাবে একটানা দশ মাস শেল নিক্ষেপিত হয়েছিলো।স্বাভাবিকভাবে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে সৈন্যদের 'শেল-শক' ছিল।এ সমস্ত শেল তৈরিতে প্রচুর বিস্ফোরক প্রয়োজন ছিলো ১৯১৬ সালে, মিত্রবাহিনী বিস্ফোরক তৈরিতে প্রয়োজনীয় নাইট্রেট অবরুদ্ধ করে রাখলে জার্মানি ভেবেছিলো গোলাবারুদ শেষ হয়ে যেতে পারে।

তবে ফ্রিটজ হ্যাবার নামে একজন রসায়নবিদ ,যিনি বিষ হিসেবে একটি গ্যাসের প্রস্তাব করেছিলেন যেটি পরবর্তীতে গোলাবারুদের অভাবের সমাধান হয়ে দাঁড়ায়।হ্যাবার এবং কার্ল বোশ অ্যামোনিয়া তৈরির জন্য বাতাসের নাইট্রোজেন ব্যবহারের একটি উপায় বের করেছিলেন।একই প্রক্রিয়া এমন সার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছিল যা কয়েক বিলিয়ন মানুষকে খাওয়াতে পারত, তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এটি গোলাবারুদ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছিল, যা দিয়ে লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করা হয়েছিল।

সাঈদ নেওয়াজ চৌধুরী
রসায়ন বিভাগ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

গল্প যখন গ্রাফিন নিয়ে

গ্রাফিন রসায়নের জগতে নতুন এক অতিথি।খুব বেশি দিন হয় নি তার আগমনের, কিন্তু অল্প দিনেই কার্বনের এই নতুন অ্যালোট্রপটি (allotrope- কোনো মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন রূপ) বিস্ময় সৃষ্টি করেছে।গ্রাফিনকে ঘিরে তৈরি হয়েছে অনেক সম্ভাবনা।সেই সাথে রসায়নে নতুন এক দিগন্ত উন্মোচন করেছে গ্রাফিন।তবে ল্যাবের গণ্ডি পেরিয়ে আমাদের জীবনে তার প্রভাব কতটা? কার্বনের অন্যান্য অ্যালোট্রপের চেয়ে গ্রাফিন কেনই বা ভিন্ন?

কার্বনের জানা তিনটি রূপভেদের সাথে আমরা সবাই পরিচিত: হীরা বা ডায়মন্ড, গ্রাফাইট এবং অ্যামরফাস (amorphous) কার্বন বা কয়লা।এই তিন সদস্যের পরিবারে পরবর্তীতে আগমন ঘটে কার্বন ন্যানোটিউব এবং ফুলারিনের ।আর এই ছোট্ট পরিবারের সর্বশেষ অতিথি হলো গ্রাফিন।

তাত্ত্বিকভাবে ১৯৪৭ সালে গ্রাফিনের যাত্রা শুরু পি. আর ওয়ালেসের হাত ধরে।১৯৬২ সালে বিভিন্ন পরীক্ষায় এর অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছিলো।২০০৪ সালে দুইজন বিজ্ঞানী, আন্দ্রে গাইম এবং কন্সতানতিন নভোসেলোভ প্রথম গ্রাফিন সংশ্লেষণ সম্পন্ন করেন।ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দুই বিজ্ঞানী তাঁদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১০ সালে যুগ্মভাবে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন।

গ্রাফিন হলো মনোলেয়ার কার্বন; কার্বনের একটি দ্বিমাত্রিক রূপভেদ যা দেখতে হানিকম্ব (honeycomb) বা ষড়ভুজ আকৃতির।গ্রাফাইটের বিল্ডিং ব্লক বা গাঁথুনি হলো গ্রাফিন।গ্রাফাইটের ১ মিমি লম্বা শিট প্রায় ৩ লক্ষ গ্রাফিন শিটের সমন্বয়ে তৈরি।ডায়মন্ড অপেক্ষা শক্তিশালী, রাবারের থেকে বেশি স্থিতিস্থাপক আবার ইস্পাত থেকে দৃঢ়, কিন্তু এলুমিনিয়াম থেকে হাল্কা- গ্রাফিনের রসায়ন কেমন অদ্ভুত ঠেকছে না? বিস্ময় কিন্তু এখানেই শেষ না!

গ্রাফিনের সংশ্লেষণ প্রথম হয় গ্রাফাইট, বা আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহৃত কাঠপেন্সিলের শিষ থেকে।পেন্সিলের গায়ে টেপ লাগিয়ে সেই টেপ থেকে প্রথম এর দ্বিমাত্রিক ক্রিস্টাল ল্যাটিস পাওয়া যায়।আর এই প্রক্রিয়াই হলো গ্রাফিনের প্রথম এবং সহজতম মেকানিক্যাল এক্সফোলিয়েশন।

গ্রাফিন যে আসলেই আলাদা তার কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক।গ্রাফিন বহুল ব্যবহৃত তামার তার অপেক্ষা ১৩ গুণ বেশি তড়িৎ পরিবাহী, ডায়মন্ড অপেক্ষা দ্বিগুণ তাপ পরিবাহী।এটি অর্ধপরিবাহী হিসেবে সিলিকনের থেকে প্রায় ১০০ গুণ ভালো।প্রতিফলিত আলোর মাত্র ২.৩% শোষণ করে এবং ক্ষুদ্র হিলিয়াম অণু একটা নিখুঁত গ্রাফিনের শিট ভেদ করতে সক্ষম নয়।

গ্রাফিনের এই অদ্ভুত ধর্মের কারণ কি? কেন গ্রাফিন অন্যান্য ন্যানোম্যাটেরিয়াল থেকে আলাদা?

সহজ কথায় বলতে গেলে এই অদ্ভুত আচরণের মূলে রয়েছে এর সন্নিবেশ।গ্রাফিনে sp2- সংকরায়ন (হাইব্রিডাইজেশন) দেখতে পাওয়া যায়।দ্বিমাত্রিক সন্নিবেশ-সম্পন্ন গ্রাফিনের তিনটি কার্বন পরমাণু আরো তিনটি কার্বন পরমাণুর সাথে - বন্ধন আবদ্ধ থাকে।আর অসংকরায়িত p অরবিটালের ইলেকট্রনটি ডিলোকালাইজড -ইলেকট্রন মেঘ হিসাবে সমস্ত শিট জুড়ে বিস্তৃত থাকে।

গ্রাফিনের আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত এর অস্তিত্ব নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ ছিল।এর আবিষ্কারের সাথে সাথেই সব ধোঁয়াশা কেটে গিয়ে রসায়নের জন্য সম্ভাবনার নতুন দুয়ার খুলে যায়।হ্যাঁ, আবিষ্কারের জন্য গাইম এবং নভোসেলোভ পদার্থবিদ্যায় নোবেল পেলেও গ্রাফিনের ধর্ম এবং তার নানা প্রয়োগ নিয়ে গবেষণা করতে গেলে আমাদের কিন্তু রসায়নের দুয়ারেই আসতে হবে।

আমরা দৈনন্দিন কাজে যেসব ব্যাটারি ব্যবহার করি, তাতে থাকে দুইটি ধাতব ইলেক্ট্রোড, অ্যানোড ও ক্যাথোড এবং সাথে একটি ইন্টারমিডিয়ারি ইলেক্ট্রোলাইট।আগে জিঙ্ক এবং আলক্যালি ভিত্তিক ব্যাটারি ব্যবহৃত হলেও এদের স্থায়িত্ব কম হওয়ায় এবং উচ্চ ভোল্টেজে কাজ করতে না পারার কারণে উচ্চ চার্জ ঘনত্ব থাকা স্বত্ত্বেও আবির্ভাব ঘটে লিথিয়াম ভিত্তিক ব্যাটারির।লিথিয়াম ব্যাটারি দুই প্রকার: নন রিচার্জেবল- অর্থাৎ অ্যানোড থেকে ক্যাথোডে একমুখী তড়িৎ প্রবাহ ঘটে এবং রিচার্জেবল লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি- যাতে উভমুখী তড়িৎ প্রবাহ ঘটে।

রিচার্জেবল লিথিয়াম ব্যাটারিতে রয়েছে porus বা ছিদ্রযুক্ত ইলেক্ট্রোড।অ্যানোড হিসাবে থাকে মেটাল অক্সাইড, মূলত লিথিয়ামের অক্সাইড এবং ক্যাথোড হিসাবে থাকে গ্রাফাইট।অ্যানোড ও ক্যাথোড ইন্টারমিডিয়েট ইলেক্ট্রোলাইটে নিমজ্জিত থাকে।ব্যাটারি থেকে তড়িৎ প্রবাহ পাওয়ার প্রসেসটিকে বলা হয় ডিসচার্জিং।এ সময়ে অ্যানোড থেকে ইলেক্ট্রন ক্যাথোডে এসে শোষিত হয়।নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ইলেক্ট্রন ইলেক্ট্রোলাইটে চলে যায়।আবার রিচার্জের সময় ঘটে উল্টো ঘটনা, অর্থাৎ ক্যাথোড থেকে অ্যানোডে ইলেক্ট্রন প্রবাহিত হয়।ক্যাথোড হিসাবে গ্রাফাইট বহুল ব্যবহৃত হলেও অ্যানোড হিসেবে $LiCoO_2$, $LiMn_2O_4$, $LiFePO_4$, $LiNaCoAlO_2$ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

গ্রাফিন-ভিত্তিক ব্যাটারিগুলোতে ক্যাথোড হিসেবে ব্যবহৃত হয় কঠিন ধাতু ও গ্রাফিনের হাইব্রিড মিশ্রণ, যাতে গ্রাফিনের পরিমাণ নির্ভর করে ব্যাটারির ধরন ও ব্যবহারের উপর।লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি ইনঅরগানিক হওয়ায় এর অনেক অসুবিধা ও সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান।কিন্তু গ্রাফিন-ভিত্তিক ব্যাটারি ব্যবহারের ফলে এই সীমাবদ্ধতা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।আর তা সম্ভব হয়েছে গ্রাফিনের অনন্য রাসায়নিক ধর্মের কারণে।গ্রাফিন যেমন ব্যাটারির মেকানিকাল শক্তি বৃদ্ধি করে, তেমনি আয়ন পরিবহনে সক্ষমতাও বহুলাংশে বৃদ্ধি করে।

প্রচলিত লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারিতে আয়ন যেমন porus ক্যাথোডে শোষিত হয়, গ্রাফিন-ভিত্তিক ব্যাটারিতে আয়ন গ্রাফিন মিশ্রিত হাইব্রিড ক্যাথোডের সারফেসে শোষিত হয় বা induced bonding ঘটে।গ্রাফিনের সাথে অন্য ধাতুর হাইব্রিড কম্পোজিট ব্যবহারে গ্রাফিনের ছাঁচে একটি নিখুঁত ম্যাট্রিক্স কাঠামো তৈরি হবে।এতে করে তড়িৎ পরিবহনের ক্যাপাসিটি এবং সাইকেল দুইটি বৃদ্ধি পায়।প্রথম ১০ সাইকেলে স্পেসিফিক এনার্জি ডেনসিটি প্রায় ১১০০ mAh g-1 হয়, যা ১৩০ সাইকেল পর্যন্ত বজায় থাকতে পারে।

গ্রাফিন শিট কার্বন ন্যানোটিউবের সাথে ব্যবহার করলে ইন্টার গ্রাফিন স্পেস বেড়ে যায় যাতে করে করে ক্যাপাসিটি শতকরা প্রায় ৪০% পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে।

লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারির অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হল লিথিয়াম সালফার ব্যাটারি।কম খরচ এবং অধিক কার্যক্ষমতা হওয়ায় এর ব্যবহার বেশ খানিকটা বেড়ে গেলেও এর বিশেষ দুর্বলতা হচ্ছে ক্যাথোডে ইন-অরগানিক লবণের অধঃক্ষেপ পড়ে, এতে করে ব্যাটারির কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়।গ্রাফিন সালফার হাইব্রিড কম্পোজিট ব্যবহারে এই ঝামেলা থেকে সহজেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব।
গ্রাফিন-ভিত্তিক ব্যাটারির ব্যবসায়িক উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণে এখনো অনেকটা পথ পাড়ি দেওয়া বাকি। Elon Musk এর Tesla motors গ্রাফিনের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে প্রথম গ্রাফিন ব্যাটারি ভিত্তিক ইলেক্ট্রিক গাড়ি উৎপাদনে কাজ করে যাচ্ছে।

Less concentration polarization & membrane fouling এবং higher permeability , selectivity এর কারনে গ্রাফিন ভিত্তিক মেমব্রেন এর ন্যানোফ্যাব্রিকেশন নিয়ে গবেষণা আরম্ভ হয়েছে।যদি এ গবেষণা আলোর মুখ দেখে, তবে লবণাক্ত পানিকে স্বাদু পানিতে রূপান্তরের খরচ এবং সময় দুই-ই কমে যাবে।ক্রমশ জলবায়ুর পরিবর্তনে যে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হচ্ছে, তাতে আমাদের মতো দেশগুলোতে লোনা পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।এই পানির লবণাক্ততা হ্রাসে ভুমিকা রাখতে পারে গ্রাফিন মেমব্রেন।

গ্রাফিনের ব্যবহারে আমরা যেমন শক্তির অপচয় কমাতে পারবো তেমনি পারবো পরিবেশের দূষণ হ্রাস করতে। গ্রাফিনের অমিত সম্ভাবনা নিশ্চয়ই একদিন ধরা দেবে হাতের মুঠোয় ।

নাফিজ ইমরান দীপ্ত
ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

What caused the ‘Space Shuttle Challenger Disaster'?

Chemistry is a very important aspect in our day to day life. The significance of chemistry in industry, pharmacy, medicine, agriculture and different orbits of life is not unknown to all. It can be equally important and life saving in the field of aerospace also. Even once the world witnessed a tragic accident of NASA because of lack of some basic knowledge of chemistry. Let us go through the incident.

In 1986, ‘ The Space Shuttle Challenger Disaster' of NASA made the whole world spellbound. This accident occurred during the 10th launch of Space Shuttle Challenger. Seven crew members died tragically after this fatal accident. Now, what was the reason for this accident? Basically, this accident occurred because of the fundamental design flaws. Investigations show that the cool temperature caused the hot gases and flames to leak out. The main reason for the leak was the failure of flexibility of a tiny rubber part ‘ O-ring' which resulted in fuel escapement and caused explosion. Now, let us see why the ring failed. Actually, the failure of this ring is significantly related to chemistry. Glass transition temperature is a very important aspect of amorphous plastics and elastomers. Basically, it is defined as the temperature at which the transition from rigid state to more flexible state occurs. Though amorphous plastics work best below glass transition temperature, elastomers must be used above this border line. Below the glass transition temperature, elastomers act as glass and could be broken easily when bent. That’s why the O-ring failed in cool temperature.

From this accident, the significance of elastomers being above glass transition temperature was clarified. Moreover, rectifying their previous mistakes NASA redesigned their next projects ensuring necessary safety. This incident depicts the importance of chemistry in every sphere of life and shows that even in the field of aerospace, the importance of chemistry is enormous.

Anika Nawar Chowdhury
Department of Chemistry
Shahjalal University of Science & Technology

Biotech for milk, Bio-tilk!!!

As Remilk states:
‘Dairy products have been traditionally consumed for generations, but relying on animals to make our food is no longer sustainable. The implications of animal farming are devastating for our planet. We are in need for a food system that takes no more than what our planet can give.’

Milk is filled with saturated fats and cholesterol and is full of lactose, making it an unhealthy drink for adults. Secondly, milk is not a sustainable product, wasting about 1000 liters of water to produce just a liter of milk, and producing a lot of wastes as well. Dairy production is known to have major environmental issues including: Soil degradation, Water quality, Manure management and emission of Greenhouse gases. The animals required for dairy farming occupy huge landfills, costing huge sums and energy and often face dire abuse. Health wise, the rise in prevalence of lactose intolerance is certainly contributing to increased demand for dairy-free. So is growing consumer concern for health, the environment and animal welfare. Remilk has successfully produced functional, versatile, animal-free milk that behaves and tastes the same way as cow’s milk; creating dairy products with no lactose, hormones, cholesterol or antibiotics, that require 5% of the resources and produce 1% of the waste compared to dairy products made using cows. They have attempted and accomplished to do so requiring less land, time, feedstock, and water. The intricate biology behind the production heavily lies on the process of microbial fermentation. They have achieved it by inserting genes encoding for milk proteins from cows to single cell microbes. The microbes are then allowed to grow and multiply for generations in microbial fermenters, each of them carrying the milk producing gene in their genetic material, when kept under appropriate conditions. The microbes then produce the key building block ingredients of milk which is chemically the same as the one that comes from the animal. The milk is then purified which can further be formulated into real dairy products. The end result, which takes a few days to achieve, is functional, versatile, animal-free milk that behaves the same way as cow’s milk.

he great advantage of this process is the milk produced can be transformed into cheese, yoghurt, and any other dairy products without any altered flavor, down sides, preserving the unique properties and essence of each dairy product, costing just about the same without any factory farming. The initiative delivers better, nutritious, clean and fuss-free milk that can be consumed and appreciated by everyone including children, lactose-intolerant, vegans, healthy and physically fit individuals. An excess of saturated fats, sugar and salt is being removed from the diet, thus lessening the calorie intake and promotes a healthy weight. Being renowned as an acidic food, milk easily disrupts a body's acid/alkaline balance; the natural milk formed by this process reduces the chance of acidity in the body, providing relief on intake. Remilk is a successful start-up that has marked its fame, aiming to 'replace cows as food factories' by creating 'every dairy product in labs'.

Real Chowdhury
Department of Biochemistry and Biotechnology.
University of Science and Technology Chittagong (USTC).

বৈরুত বিস্ফোরণ

৪ ঠা আগস্ট, ২০২০।লেবাননের রাজধানী বৈরুতে ঘটে যায় এক অভূতপূর্ব ঘটনা।রাজধানী বৈরুত থেকে অদূরে পোর্ট এলাকায় রাসায়নিক গুদামে বিস্ফোরণে মুহূর্তেই স্তব্ধ হয়ে যায় গোটা দেশ।সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এই যুগে সেই বিস্ফোরণের সংবাদ পৌছে যায় মুহূর্তেই।গোটা বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে যায় ঘটনার আকস্মিকতায়।হাজার হাজার লেবানিসের কান্না আর স্বজন হারানোর বেদনায় ভারি হয়ে উঠে বৈরুতের বাতাস। রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং করোনা মহামারির এই সময়ে এই ঘটনা লেবাননের মানুষের জন্য ছিল কফিনে শেষ পেরেক।

বিস্ফোরণ তৎক্ষণাৎ প্রাণ হারায় ২২০ জন, প্রায় ৫ হাজারেও বেশি মানুষ আহত এবং ৩ লক্ষের বেশি মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে।বিস্ফোরণে আশেপাশে ৩ কিমি এলাকা জুড়ে ভয়াবহতা ছড়িয়ে পড়ে।কয়েক শত ভবন ক্ষতিগ্রস্থ হয়, এমনকি বৈরুত বন্দরে থাকা বাংলাদেশের নৌ বাহিনীর জাহাজ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হয়।সুদূর সাইপ্রাস থেকেও এই বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছিল।

এই বিস্ফোরণের পরপরই কিছুদিনের মধ্যে পদত্যাগ করেন লেবাননের প্রধানমন্ত্রী হাসান দিয়াব।বৈরুত বন্দরে মজুতকৃত ২,৭৫০ টন আমনিয়াম নাইট্রেট থেকেই এই অগ্নিকান্ডের উৎপত্তি ।

অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ঘটিত বিস্ফোরণ নতুন নয়।

১৯১৬ সাল থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৩০ টি অগ্নিকান্ডের ঘটনায় মুল খলনায়ক ছিল এই অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট। বৈরুতের এই ঘটনার সাথে ১৯৪৭ সালে সংঘটিত টেক্সাস বিস্ফোরণের মিল পাওয়া যায়।S.S. Grandcamp টেক্সাস থেকে হিউস্টোন আসার সময় অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ঘটিত অস্ত্র এবং বারুদ থেকে সংঘটিত অগ্নিকান্ডে মৃত্যু হয় প্রায় ৬০০ জনের আর আহত প্রায় ৫০০০ এর মতো মানুষ।সর্বশেষ এই অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট জনিত দুর্ঘটনা খুব সম্ভবত “West Fertilizer Company” তে ।এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় ২০১৩ তে।তবে বৈরুতের মতো তীব্রতা আর ভয়াবহতার দৃষ্টান্ত খুব কম আছে।

অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এই শ্বেত, স্ফতিকাকার পদার্থ।এর রাসায়নিক ফরমুলা NH_4NO_3।হাইগ্রোস্কোপিক, নন হাইড্রেট এই পদার্থের অনেক ব্যবহারের একটি হচ্ছে নাইট্রোজেন সার এবং অস্ত্র তৈরিতে।২০১৭ সালে ২০ মিলিয়ন অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট সারা বিশ্বে উৎপাদিত হয়।বিশেষজ্ঞদের মতানুযায়ী অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এর যথাযথ সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণে ত্রুটির কারনেই বছর বছর এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনার জন্ম যার ফলশ্রুতিতে হাজার হাজার প্রাণ অকালেই ঝড়ে যাচ্ছে।

অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের রসায়নের দিকে তাহলে একটু নজর দেওয়া যাক এবার।

অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট দানা দেখতে বিডের মতো, অনেকটা কুকিং সল্টের মতো কিনতে সস্তা।অদাহ্য হলেও এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং মজুতে বিশেষ যত্নশীলতা প্রয়োজন।বৈরুতের হাঙ্গারে টন কে টন অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট মজুত ছিল ৬ বছর যাবৎ।বছর বছর বাতাসের আদ্রতায় শুষে এই বিশাল পাইল হয়েছে প্রস্তর কঠিন।NH_4^+ এবং NO_3^- এই দুই আয়নের সমন্বয়ে ঘটিত এই লবণে নাইট্রোজেন পরমাণুর দুই ধরনের জারন মান থাকে, যথাক্রমে -3 এবং +5।

কোনো কারনে অত্যধিক শক্তি পেলে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট অণুতে এক প্রকার অস্থিতিশীলতা তৈরি হয়।বৈরুতের বিস্ফোরণে আশেপাশে কোথাও অগ্নিকান্ডের সুচনা ঘটে যা দ্রুত অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের গুদামের সংস্পর্শে চলে আসে। অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের বিস্ফোরণসহ বিয়োজন বিক্রিয়া সংঘটিত হতে প্রায় ৪০০০ ফারেনহাইট তাপের প্রয়োজন। অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের বস্তার সঙ্গে থাকা কার্ডবোর্ড, কাগজের মতো কার্বন সমৃদ্ধ উপাদানের সংস্পর্শে এসে এই তাপশক্তি অর্জিত হতে পারে।এই বিশাল তাপশক্তি গুদামের গুমোট পরিবেশে সঞ্চিত হয়ে বিস্ফোরণ ঘটাতে সাহায্য করেছে।

ফলশ্রুতিতে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বিয়োজিত হয়ে নাইট্রোজেন গ্যাস ,বাষ্প এবং অক্সিজেনের সাথে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড তৈরি করে।অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের অ্যামোনিয়াম মূলক বিজারক এবং নাইট্রেট মূলক জারক হিসাবে কাজ করে।সম্পূর্ণ বিক্রিয়াটি একটি তাপোৎপাদি বিক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রচুর শক্তি প্রকৃতিতে উন্মুক্ত হচ্ছে।

অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এর বিস্ফোরণের ফলে একটি বিশাল ধোঁয়ার কুণ্ডলী তৈরি হয়।বিস্ফোরণকালে মজুদকৃত অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের বিয়োজনে সৃষ্ট গ্যাসের থেকে এই কুণ্ডলীর সৃষ্টি ।

$NH_4NO_3 \rightarrow N_2O + 2H_2O$; স্বাভাবিক অবস্থায়
$2NH_4NO_3 \rightarrow 2N_2 + O_2 + 4H_2O$; উচ্চ তাপমাত্রায়

এই অনিয়ন্ত্রিত বিয়োজন বিক্রিয়ায় প্রারম্ভে একটি প্রেশার ওয়েভ তৈরি হয়।বিক্রিয়াটি দুই ধাপে শুরু হয়।প্রথমত ডিফ্লাগ্রেশন প্রতিটি অণুতে শব্দের চেয়ে কম বেগে স্রোতের মতো বিয়োজন বিক্রিয়া অগ্রসর হতে থাকে।শক্তির পরিমাণ বাড়তে থাকলে তা-ই একসময় ডেটোনেশনে রূপ লাভ করে, বেগ শব্দের বেগকে অতিক্রম করে এবং বিস্ফোরণ ছড়িয়ে পড়ে।এতে করে পার্শ্ববর্তী বায়ুমণ্ডলে একটি নিম্ন চাপ তৈরি হয় যাতে করে বায়ুতে থাকা পানির বাষ্প ঘনিভুত হতে শুরু করে।এই কারনে সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখতে পাওয়া গেসে।বায়ুচাপ আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসলে ঘণিভুত পানি আবার বাস্পে রূপ লাভ করে।সৃষ্ট প্রেশার ওয়েভের তীব্রতা এই অগ্নিকান্ডকে বিস্তারে সহায়তা করেছে।

লাল ধোঁয়ার যে কুণ্ডলী দেখতে পাওয়া গেসে তা মূলত নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইডের।আলোর প্রতিসরণ-জনিত কারনে এই কুণ্ডলীর এমন অরুণাভ দেখতে পাওয়া গেসে।

রাসায়নিক দ্রব্য মজুদের নির্দিষ্ট নীতিমালা পৃথিবীর সব দেশেই বিদ্যমান।এত পরিমাণ অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বছরের পর বছর এভাবে পোর্টে ফেলে রাখা স্পষ্টত সেই নীতিমালার লঙ্ঘন।জনবসতির আশেপাশে রাসায়নিক দ্রব্যের মজুদ সব দেশেই নিষিদ্ধ থাকলেও এক্ষত্রে তা মানা হয়নি।

বৈরুতের এই ঘটনা এবারই প্রথম না এবং নিশ্চিতভাবেই শেষ নয়।নিমতলি এবং চকবাজার এর অগ্নিকান্ডের ঘটনায় শত শত মানুষের জীবন হয়েছে বিপন্ন।রাসায়নিক উপাদানের নিরাপদ মজুদ বিষয়ক আইন থাকলেও নেই তার প্রয়োগ আর তাই ভবিষ্যতে এই ধরনের দুর্ঘটনার ঘটার আশংকা থেকেই যাচ্ছে।বৈরুতের এই ঘটনা বিশ্ববাসীর জন্য একটি বার্তা।

নাফিজ ইমরান দীপ্ত
ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

CRISPR

CRISPR is the technology that was awarded the 2020 Nobel Prize in chemistry, it is the tool that has revolutionized the field of genetic engineering, the technology that holds the potential to solve many present problems of the human race .

So, what is CRISPR? By crispr we actually mean the CRISPR-Cas system. CRISPR stands for Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats of DNA that is found in the prokaryotic cells. And Cas is a CRISPR-associated protein nuclease that cuts DNA. Cas9 is the most popular Cas protein.

In nature, this CRISPR system acts as the immune system of bacteria. When a virus invades the prokaryotic cell, the cell sends the Cas9 protein that cuts the DNA of the virus and destroys it. And the Cas9 protein is directed to the viral genome by a guide-RNA (gRNA). This guide RNA is what is transcribed from the CRISPR region.

The CRISPR array has ‘spacers’ between its palindromic sequences which were acquired by a Cas complex during the first attack of the virus. These spacers code for crRNA (one of the two segments of gRNA) that matches a part of the viral genome and base pairs with it. This base pairing helps the Cas9 protein to cut the DNA of the virus specifically. The palindromic sequences of the array code for the tracrRNA of the guide RNA that acts as a scaffold.

Later, it was discovered that this system doesn’t just work on viruses. Rather, it can make cuts in the DNA of any organism, including humans, at any site we wish. Today, this combination of RNA and Cas protein is altered in many ways to edit various genes precisely. This technology is the latest, easiest and cheapest method of genetic engineering with extreme accuracy.

CRISPR is used in research to know the functions of gene, DNA labeling and disease diagnosis. It can be used in agriculture to produce novel plants with resistance for diseases, pests and abiotic stresses and plants with high nutrient content. Scientists are trying to engineer microalgae for renewable bioenergy production with it. The guide RNA can be designed with any desired sequence and targeted to fix mutations that cause genetic disorders like sickle cell anemia, genetic blindness etc. to destroy infectious viruses in the body like HIV; or to arm immune cells to fight against cancer. It has already been used to make designer babies.

The potential uses of CRISPR are unending. But with its great power comes great ethical issues. It can't fall into wrong hands that may misuse its potential with the aim of bioterrorism. We hope that it is used with the purpose of human welfare and not the opposite

Wasima Chowdhury
Biotechnology and Genetic Engineering
Sylhet Agricultural University